সায়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.

তাওহিদ
প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে

আলী হাসান উসামা
অনূদিত

লেখক পরিচিতি

মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. সেই যে ত্রিশের দশকে তাঁর পূর্বপুরুষ বালাকোটের শহিদ আমিরুল মুমিনিন হজরত সায়্যিদ আহমদ বেরেলবি রহ.-এর অনুপম চরিতগ্রন্থ 'সিরাতে সায়্যিদ আহমদ শহিদ' লিখে তারুণ্যদীপ্ত বয়সেই উর্দু সাহিত্যের আসরে নিজের একটি উল্লেখযোগ্য আসন করে নিলেন, তারপর বিগত প্রায় পৌনে এক শতাব্দী ধরে তাঁর কলম অবিশ্রান্তভাবে লিখে গেছে মুসলিম ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়গুলোর ইতিবৃত্ত। পাঁচ খণ্ডে রচিত 'তারিখে দাওয়াত ও আজিমত'-এর বঙ্গানুবাদ 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস' তাঁর এমনই একটি অমূল্য গ্রন্থ। সিরাত থেকে ইতিহাস, ইতিহাস থেকে দর্শন ও সাহিত্য পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর অবাধ গতি। তাঁর 'মা-যা খাসিরা'ল-আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন' islam and the world –এর বঙ্গানুবাদ 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারাল?' একখানি চিন্তাসমৃদ্ধ অনবদ্য আরবি গ্রন্থ, যার অনুবাদ পৃথিবীর অনেক ভাষায় হয়েছে। 'নবিয়ে রহমত' ছাড়াও তাঁর রচিত 'আল-মুরতাজা' শীর্ষক হজরত আলি রা.-এর জীবনী গ্রন্থখানি আরবি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় প্রভূত সুনাম অর্জন করেছে। সমসাময়িক বিশ্বে তাঁর চাইতে অধিকতর খ্যাতিমান ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অন্য কোনো আলিম জন্মেছেন কি না এবং থাকলেও তাঁর মতো এত অধিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন কি না সন্দেহ রয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রায় সকল জনপদে যেমন তিনি আমন্ত্রিত হয়ে সেসব দেশ সফর করেছেন, তেমনি নোবেল পুরস্কারতুল্য মুসলিম বিশ্বের সবচাইতে মূল্যবান 'বাদশাহ ফয়সাল' পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন।

বাকি অংশ অপর ফ্ল্যাপে দেখুন...

বই : তাওহিদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে
মূলগ্রন্থ : দীনে হক আওর উলামায়ে রব্বানি শিরক ও বিদআত কে খেলাফ কিউঁ
রচনা : সায়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.
নতুন বিন্যাস : শাইখ উবায়দুর রহমান মুরাবিত
ভূমিকা : শাইখ রাবি হাসানি নদবি
অনুবাদ : আলী হাসান উসামা
প্রকাশনা : শব্দতরু

তাওহিদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে

সায়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.

আলী হাসান উসামা
অনূদিত

তাওহিদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে

সায়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.

প্রথম প্রকাশ
রমজান ১৪৪০ হিজরি / মে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

পরিবেশক
মাকতাবাতুন নূর
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
০১৮৫৭-১৮৯১৪৪, ০১৯৭১-৯৬০০৭১

অনলাইন পরিবেশক
wafilife.com
ruhamashop.com
rokomari.com

প্রকাশক
ইবনে মুশাররফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই
শব্দতরু কম্পোজিং এন্ড প্রিন্টিং

মূল্য : ৯৬ ৳

+৮৮ ০১৮৬৬ ০৫১১৪০

In the struggle for the establishment of Tauhid
A Translation of Abul Hasan Ali al Hasani an Nadvi's *Deen-e Haq and Ulama-e Rabbani* in Bengali by Ali Hasan Osama
Published by Shobdotoru
shobdotoru@gmail.com
www.facebook.com/sobdotoru.bd

মুখবন্ধ

উম্মাহর সামনে শরিয়াহর ইমারত বিনির্মাণের পূর্বে সর্বপ্রথম আকিদার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা উপস্থাপন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মাক্কি জীবনে দীর্ঘ তেরো বছরজুড়েই কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হয়েছে। এই পুরো সময়ে কুরআন শুধু কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ব্যাখ্যাই তুলে ধরেছে। কুরআন এ জন্যই এত দীর্ঘ সময়ব্যাপী আকিদার ব্যাখ্যা করেছে, যাতে করে তা অন্তরের অন্তস্থলে দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়ে নেয়। কারণ, এই পুরো দীন, এর বিস্তৃত পূর্ণাঙ্গ রূপ এবং এর ইবাদত-বন্দেগির সব বিধিবিধান এই একটিমাত্র ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তা হচ্ছে কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই।

এই দীন এমন একটি বৃক্ষের মতো, যার শিকড় জমিনের অনেক নিচে প্রোথিত আর যার শাখা-প্রশাখা আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। যদি বৃক্ষের ফলফলাদির পরিমাণ অনেক বেশি হয় তাহলে বোধগম্য হয় যে, তার শিকড় অবশ্যই অনেক গভীরে প্রোথিত। অন্যথায় বৃক্ষটি এত ভার কখনোই সামলাতে পারত না। একইভাবে এই দীনের শিকড়—অর্থাৎ কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-ও অনেক বেশি গভীরে প্রোথিত হওয়া প্রয়োজন। অন্তরে যদি ইমান গভীরতাসম্পন্ন হয় তাহলে দীনের বৃক্ষ ফলফলাদির প্রচণ্ড ভারও সহজে সামলে উঠতে পারবে। এ কারণেই আজ যেসকল ব্যক্তি এই দিবাস্বপ্ন দেখে বসে আছে যে, মানুষের সামনে ইসলামি অর্থনীতির যথার্থ ব্যাখ্যা তুলে ধরে, ইসলামের সামাজিক বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করে, ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সৌন্দর্য আলোচনা করে কিংবা ইসলামের চারিত্রিক গুণাগুণের গীত গেয়ে মানুষের অন্তরে ইমানের ভালোবাসা সৃষ্টি করে ফেলা সম্ভব, নিশ্চয়ই তারা ভুলের মধ্যে রয়েছে। তারা এই দীনের চাহিদা বুঝতে পারেনি এবং তারা এর মূলভিত্তির পরিচয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি।

এ জন্যই আমাদের ওপর অপরিহার্য হলো, আমরা মানুষকে কেবল শাখা-প্রশাখার প্রতি আকৃষ্ট করার ভিত্তিতে আমাদের দাওয়াহর কার্যক্রম পরিচালিত

করব না; বরং আমরা মানুষের অন্তরে আকিদার শিকড় গেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের দাওয়াহর সূচনা করব। অন্তরের জমিনে যদি আকিদার শিকড় দৃঢ়ভাবে স্থান গেড়ে নেয় তাহলে তারা আমাদের সব কথাবার্তা নির্দ্বিধায় মেনে নেবে। কিন্তু আমরা যদি তাদেরকে শুধু নামাজের বিধান অবগত করি, ওজুর উপকারিতা বর্ণনা করি, নারীদের অধিকার সংরক্ষণে ইসলামের উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তুলে ধরার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি, শাসকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ইনসাফের গুরুত্বই আলোচনা করি তাহলে এই ধারাবাহিকতা শুধু দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতরই হবে। তারা প্রতিদিন আপনার সামনে নিত্যনতুন সংশয় উত্থাপন করবে, নতুন নতুন প্রশ্ন করে রেখে দেবে; যাতে করে আপনি এগুলোর জবাব দিতে থাকেন। দীন এই পন্থায় সূচিত হয়নি।

যে ব্যক্তি মানুষকে শুধু ইসলামি অর্থনীতির সৌন্দর্য কিংবা ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থার গুণগান বর্ণনা করার দ্বারা ইসলামে অনুপ্রবেশ করাতে চায় আর এ ক্ষেত্রে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'র মর্মার্থ অন্তরে বসানোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না, তার অবস্থা হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে জমিনে বীজ রোপন না করে শূন্যে বীজ বপন করে। সে বাতাস থেকে বৃক্ষ পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষার প্রহর গোনে। কিন্তু পরিতাপের কথা হলো, এই প্রতীক্ষা তো কোনোদিনও সমাপ্তির মুখ দেখবে না।

তাওহিদের আকিদার এই গুরুত্বই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, যেন আমি এই উপমহাদেশের পাঠকদের সামনে সায়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.-এর বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি নতুন বিন্যাসে উঠিয়ে আনি।

দ্বিতীয় কথা হলো, সায়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. এই পুস্তিকায় হাকিমিয়্যাহর কুফর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন; যা এই যুগে ইসলামি পুনর্জাগরণী আন্দোলনের মূলভিত্তি। প্রশাসনিক চাপের কারণে এ বিষয়ে খুব কম আলিমই কলম উঠিয়েছেন। মাওলানা আলি মিয়াঁ রহ. অত্যন্ত স্পষ্টভাবে শরিয়াহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক সকল শাসনব্যবস্থা এবং মানবরচিত আইনকানুনের কুফর তুলে ধরেছেন। বর্তমান সময়ের প্রত্যেক মুসলিমের এ মাসআলাটি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত জরুরি।

আলহামদুলিল্লাহ এখন ভারত উপমহাদেশে, বিশেষ করে ২০০৭ সালের জামিয়া হাফসা ট্রাজেডির পর থেকে ব্যাপকভাবে জিহাদি চেতনার পুনর্জাগরণ ঘটেছে। এই জিহাদি আন্দোলনকে সামনে রেখে দীনের ধারক ও শরিয়াহর রক্ষক আলিমগণের দায় ও কর্তব্যও দ্বিগুণ বেড়েছে। একদিকে দীনের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রচার-প্রসার। আবার অন্যদিকে দীনের হেফাজত ও সশস্ত্র জিহাদ। উল্লেখিত উভয় ক্ষেত্রই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। যেখানে কুফরের অবাধ প্রবাহ রোধ করার জন্য অস্ত্রের একান্ত প্রয়োজন, সেখানে আবার সমাজবাসীর ইমান ও আমল রক্ষা করার জন্য জবান ও কলমেরও প্রয়োজন। ইসলামি চিন্তাধারা এবং রাজনীতি—এই উভয় ক্ষেত্রে উম্মাহর সামনে সত্য দীনের যথার্থ রূপরেখা উপস্থাপন করা এবং সেটাকে কার্যে পরিণত করা বর্তমানে হকপন্থী আলিমগণের ওপর ফরজ। এই গুরুত্বপূর্ণ ফরজ আদায়ে উদ্যোগী হওয়ার জন্যই এ কিতাবটি প্রত্যেক সচেতন মুসলিমকে আহ্বান করছে। আল্লাহ তাআলা সবাইকে তাওফিক দান করুন। আমিন। (সংক্ষেপিত)

- উবায়দুর রহমান মুরাবিত

প্রারম্ভিকা

হজরত আদম আ. থেকে শুরু করে হজরত মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সব নবি সবচে মৌলিক ও কেন্দ্রীয় যে দাওয়াত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, তা ছিল তাওহিদের দাওয়াত। তাদের অন্য সব দাওয়াত ছিল এর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এর পরবর্তী স্তরে স্থিত। কুরআন মাজিদে যেখানে যেখানে নবিগণের কথা আলোচনা হয়েছে এবং তাদের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই প্রথম বাক্য দেখা যায়—

اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।'[১]

অত্যাধিক পরিমাণে এ কথার ওপর গুরুত্বারোপ করতে দেখা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কিংবা সাহায্য প্রার্থনার উপযুক্ত কেউ নেই। সুরা ফাতিহা—যে সুরা প্রতিদিন পাঁচ বেলার নামাজের প্রত্যেক রাকাতে পাঠ করা হয়—তাতে এই আয়াতটি পাঠ করা একান্ত অপরিহার্য—

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

'আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।'[২]

এই আয়াতে 'আপনারই' শব্দের উল্লেখ এ দিকটির প্রতিই গুরুত্বারোপ করছে যে, একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করা হবে এবং শুধু তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হবে।

---

১. উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য—সুরা হুদ : ৮৪
২. সুরা ফাতিহা : ৪

এই কথা বারবার কেন বলানো হয়? কেন নামাজে বারবার পাঠ করানো হয়? যার মর্মার্থ হলো, মৃত্যু বরণ করা পর্যন্ত সর্বদা মুখে যেন এই কথা জারি থাকে—'আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং শুধু আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি'।

এর দ্বারা ইসলামে তাওহিদের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। ইসলাম শুধু একবার কালিমাতুশ শাহাদাহ উচ্চারণ করে মুসলমান হয়ে যাওয়াকে যথেষ্ট মনে করে না; বরং সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ও রাত সর্বদা এমন বাক্য বলাতে থাকে, যার দ্বারা তাওহিদের স্মরণও হয়ে যায় এবং বারবার তাওহিদের স্বীকৃতির পুনরাবৃত্তিও হয়।

একজন মুসলিম দিনে অসংখ্যবার সবচে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যখন সে তাঁর রবের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে এই ঘোষণা দেয়—

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

'আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।'[৩]

এরপর কীভাবে তার জন্য সম্ভাবিত হবে যে, সে নামাজ থেকে বের হয়ে অন্য কারও ইবাদতে রত হবে কিংবা অন্য কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে? এই বিপরীতমুখী দুটো ব্যাপার কি আদৌ একত্রিত হতে পারে? তা ছাড়া সে আদতে এমনটা করে বসলেও আমাদের মহান প্রতিপালক কি সেটাকে চরম ধোঁকা ও দাগাবাজি হিসেবে গণ্য করবেন না যে, বান্দা মুখে বলছে একটা আর বাস্তবে করছে আরেকটা? এ তো বড় বিপদজনক ও ভয়ংকর ব্যাপার।

মুসলমানের সবচে বড় ইবাদত হলো নামাজ। যার মধ্যে রয়েছে কিয়াম, রুকু এবং সিজদা। এগুলোর দ্বারাই নামাজ গঠন লাভ করে। বান্দা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশে এই একনিষ্ঠতা ও শিষ্টাচারের সঙ্গে ঝোঁকে অথবা কিয়াম করে, যে একনিষ্ঠতা ও শিষ্টাচার নামাজের হক, যার ঘোষণা আমরা সুরা ফাতিহার মধ্যেই এভাবে দিয়ে থাকি—

---

৩. সুরা ফাতিহা : ৪

ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ

'পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু, বিচার দিবসের মালিক।'[৪]

অথবা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে একই ইখলাসের সঙ্গে সাহায্য প্রার্থনা করে, যেমনটা নামাজে করা হয়ে থাকে তাহলে কি এগুলো 'আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি' বলার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় না? এটা কি নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে ধোঁকাবাজির নামান্তর হয় না?

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কিংবা অন্য কারও কাছে সাহায্য কামনা যদি সেভাবে হয়ে থাকে, যেভাবে একজন মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় এবং তার কাছে সাহায্য কামনা করা হয় তাহলে এটা গাইরুল্লাহর ইবাদত এবং গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা হিসেবে বিবেচিত হয় না আর এটা নিষিদ্ধ কর্মেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। আমরা আমাদের বাবাদের শ্রদ্ধা করি। শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করি। অনুগ্রহকারীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ লালন করি। তাদের স্নেহপরায়ণতা, ভালোবাসা এবং সহমর্মিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। তারা আমাদের যে ধরনের সাহায্য করার সক্ষমতা রাখে, আমরা তাদের কাছে সে ধরনের সাহায্যও কামনা করি। এসব কিছু দূষণীয় নয়। তবে আমরা যদি কোনো মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা সেভাবে এবং সেই পন্থায় প্রদর্শন করি, যেভাবে প্রতিপালকের প্রতি প্রদর্শন করা হয় এবং যে পন্থা মানুষের মর্যাদার চাইতে ঢের উচ্চাঙ্গের তাহলে আর সেই শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা থাকে না; বরং তা ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়।

তাওহিদ কী এবং শিরক কী? শিরকের ছোট ও বড় পথ ও পদ্ধতি কী? এসব কিছু আমাদের খুব ভালোভাবে জেনে নেওয়া উচিত; যাতে করে আমরা শিরকের আপদে আক্রান্ত না হই এবং আমাদের পরকাল ধ্বংস না হয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা বান্দার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন; কিন্তু শিরক ক্ষমা করে না। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে :

---

৪. সুরা ফাতিহা : ২-৩

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ এই অপরাধ ক্ষমা করেন না যে, তার সঙ্গে কাউকে শরিক করা হবে। এরচে নিচের যেকোনো অপরাধে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করে, সে এমন এক অপবাদ আরোপ করে, যা গুরুতর পাপ।'[৫]

এই ভয়াবহ ত্রুটি, ধ্বংসাত্মক অপরাধ এবং সব আমল নিশ্চিহ্নকারী গুনাহের জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ। দেশের মধ্যে যেমন এ ধরনের কিছু অপরাধকর্ম থাকে, যার শাস্তি হিসেবে ফাঁসিদণ্ড সুনির্ধারিত থাকে; বস্তুত শিরকের অপরাধ এর চাইতেও অনেক বেশি গুরুতর। কারণ, ফাঁসি অবধারিতকারী অপরাধ শুধু কয়েক বছরের সংক্ষিপ্ত এক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়; কিন্তু তা অনন্তকালের জীবনের কোনো ক্ষতি করে না। পক্ষান্তরে শিরকের কারণে অবধারিত শাস্তি তো অনন্তকালের জীবনকে জাহান্নামে পরিণতকারী ভয়াবহ শাস্তি।

হজরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.—যিনি নিজে একজন বড় বুজুর্গ, বুজুর্গদের সম্মান এবং ওলিগণের মর্যাদা সম্পর্কেও অবগত এবং দীনি জ্ঞানের স্বরূপ ও রহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত—বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটিকে কুরআন এবং হাদিসের আলোকে তাওহিদ ও শিরকের স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার নিমিত্তে রচনা করেছেন। তিনি এতে আলোচ্য বিষয়ের ওপর এমনভাবে আলোকপাত করেছেন যে, তাওহিদ ও শিরকের বিভিন্নমুখী দিকগুলো খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। একজন একনিষ্ঠ মুসলমানের তাওহিদ ও শিরকের স্বরূপ সম্বন্ধে যা কিছু জানা প্রয়োজন, এ পুস্তিকাটির মাধ্যমে তা খুব ভালোভাবেই জানা হয়ে যাবে।

বিদগ্ধ লেখক আমাদের সবার কৃতজ্ঞতা পাওয়ার উপযুক্ত। কারণ, তিনি এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ ও অতি প্রয়োজনীয় বিষয়কে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর

---

৫. সুরা নিসা : ৪৮

রাসুলের সুন্নাহর আলোকে বড় উত্তম ও সহজ পন্থায় সুস্পষ্ট করেছেন। তিনি এর পাঠকদের উদ্দেশে বিশুদ্ধ দীন— أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ 'জেনে রেখো, বিশুদ্ধ দীন কেবল আল্লাহরই জন্য'[৬]—এর স্বরূপ সহজ ও সাবলীলভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আশা করা যায়, পুস্তিকাটি অত্যন্ত উপকারী হবে। প্রকাশনীও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার দাবি রাখে, তারা এই গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকাটিকে মুসলমানদের হাতে হাতে পৌঁছানোর জন্য সুব্যবস্থা করে দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বিশুদ্ধ দীন অনুধাবন করার এবং তদনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মুহাম্মাদ রাবি হাসানি নদবি
২৫-০৪-১৪০৩ হিজরি

৬. সুরা জুমার : ৩
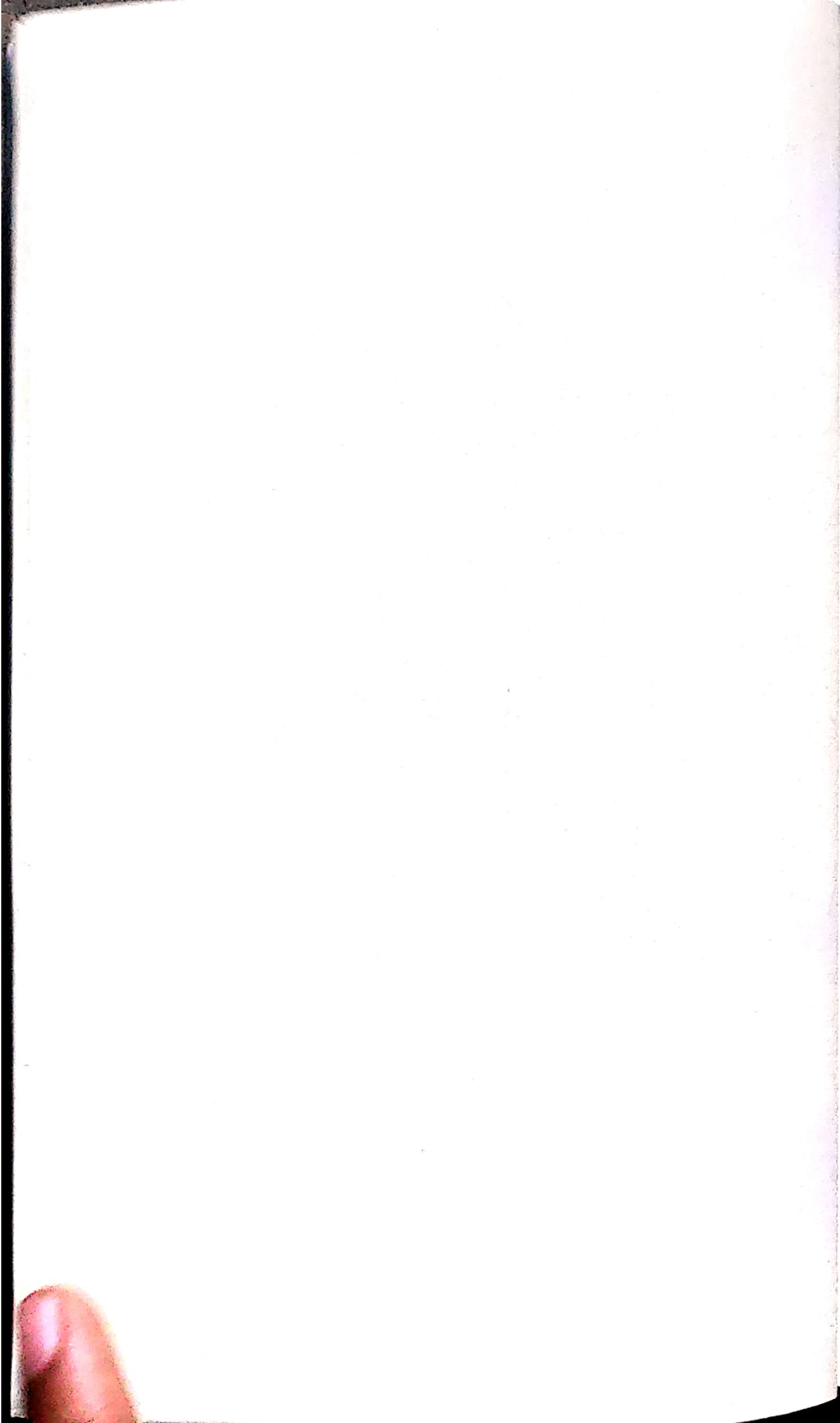
লেখকের কথা

বেশ অনেক দিন হলো, আমি নিকটবর্তী কয়েকজন হকপন্থী আলিম—যাদের মধ্যে সায়্যিদ খাজা আহমদ নাসিরাবাদি রহ.-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—এর আত্মশুদ্ধি ও সংস্কারমূলক কর্ম ও কীর্তির ওপর আলোকপাত করে নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ লেখার সুদৃঢ় ইচ্ছা লালন করে আসছি।[৭] সে সময় এ বিষয়টির গুরুত্ব মানসপটে জেগে উঠল যে, এর পূর্বে সুন্নাহর গুরুত্ব, রহস্য ও তাৎপর্য এবং বিদআতের অনিষ্টতা ও ক্ষতি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন এবং সাথে এ বিষয়টিও পরিষ্কার করা প্রয়োজন যে, বিদআত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার উম্মাহকে কেন এত জোরদারভাবে নিষেধ করে গেলেন। কেন বিদআতের ব্যাপারে এত বেশি নিন্দা জ্ঞাপন করলেন এবং প্রচণ্ড ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর প্রত্যেক যুগে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রকৃত উত্তরসূরি, আল্লাহওয়ালা আলিম, সমাজসংস্কারক এবং উম্মাহর মুজাদ্দিদরা কেন বিদআতের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝাণ্ডা উঁচু করেছেন এবং সময়ের বহুমুখী সামাজিক, রাজনৈতিক, এমনকি দাওয়াতি ও তাবলিগি স্বার্থের দিকে তাকিয়ে হলেও এক মিনিটের জন্য তা বরদাশত করে নেননি এবং তার ব্যাপারে কোনো ধরনের শৈথিল্য কিংবা ঢিলেমি প্রকাশ করেননি। আমি এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসের অধ্যয়ন, উম্মাহর বিভিন্ন সময়ের অভিজ্ঞতা এবং জীবনের বাস্তবতার আলোকে সুন্নাহ ও বিদআতের পার্থক্য এবং বিদআতের ক্ষতি ও অনিষ্টতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

এই প্রাথমিক আলোচনা 'উলামায়ে রব্বানি : উন কা মানসিব আওর উন কে কাম কি নাওইয়্যাত' নামে ১৯৪২ সালে মাসিক আল-ফুরকান ও আন-নাদওয়াহ পত্রিকার জুন-জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এরপর আমি অন্যান্য লেখালেখির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় এ বিষয়টি পুরোদস্তুর বিস্মৃত হয়ে যাই। কিছু প্রিয়জন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, এ বিষয়টি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

৭. পরবর্তীকালে এটা কারওয়ানে ইমান ও আজিমত নামে পাকিস্তান লাহোরের সায়্যিদ আহমদ শহিদ একাডেমি থেকে সুবিন্যস্ত আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

এতদসংক্রান্ত এমন কিছু মৌলিক কথাবার্তা নিবন্ধে এসেছে, যা সাধারণ অন্যান্য বইপত্রে পাওয়া যায় না। তাদের কথা শুনে লেখাটি বের করে আমি পুনরায় পাঠ করি। তখন এর গুরুত্ব ও উপকারিতা আমার চোখেও ধরা দেয়। আমার ইচ্ছা ছিল, এটাকে আলাদা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হবে; যাতে এর উপকারিতা ব্যাপক হয়। এ পরিস্থিতিতে প্রিয় মৌলবি ইমতিয়াজ আহমদ নদবি ও মৌলবি ইফতিখার আহমদ নদবি অভিপ্রায় জানাল যে, তারা এই পুস্তিকাকে তাদের নতুন প্রতিষ্ঠিত মাকতাবা উসমানিয়্যাহ থেকে প্রকাশ করবে। আমি সন্তুষ্টচিত্তে তাদেরকে অনুমতি দিলাম। আল্লাহর কাছে দুয়া করি, তিনি যেন এ পুস্তিকাটিকে মুসলিম উম্মাহ এবং সবশ্রেণির পাঠকদের জন্য উপকারী বানান এবং এ থেকে তাদের চিন্তা ও ভাবনার খোরাক জোগান। আমিন।

আবুল হাসান আলি নদবি
১৯-০৪-১৪০৩ হি.
০৩-০৩-১৯৮৩ খ্রি.

প্রকাশকের কথা

ব্যক্তিক পর্যায় থেকে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিসরে দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় বাধা হলো এই ক্ষেত্রগুলোতে শিরক, বিদআত, উদাসীনতা ও আচার-রীতি প্রথার উপস্থিতি। শিরক ও বিদআতের বিষবৃক্ষ যাবত না সমূলে উৎপাটিত হবে; সর্বময় তাওহিদ ও দীন প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হবে না। শিরক ও বিদআতের উপাদান-উপলক্ষগুলো চিত্তাকর্ষক হয় বিধায় একে যৌক্তিক ভিত্তি পাইয়ে দিতে শয়তান ও তার মানুষরূপী দোসররা যারপরনাই চেষ্টা-তদবির করে যায় অবিরল।

সকল নবি-রাসুল শিরক ও বিদআতের মূলোৎপাটন করে নিরঙ্কুশ তাওহিদ প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। নবিগণের উত্তরাধিকারী উম্মাহর আলিমদের কাঁধেও এ গুরুদায়িত্ব আবশ্যিকভাবে বর্তায়। যুগে যুগে উম্মাহর বরেণ্য আলিমগণও এ মহান দায়িত্ব পালনের পথে অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করেছেন।

সায়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.-এর রচনা মানেই অনবদ্য সৃষ্টি। উম্মাহর দরদী এ ক্ষণজন্মা মনীষী তাওহিদের সাথে শিরক ও বিদআতের সাংঘর্ষিক অবস্থানের বিষয়টি দারুণভাবে আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। অনেক দুর্লভ সংগ্রহ এটি। পাঠককে ভালো কিছু উপহার দেয়ার প্রতিশ্রুতি থেকেই আমাদের এবারের এই আয়োজন। মুহতারাম আলী হাসান উসামার সাবলীল অনুবাদ আশা করি পাঠককে মূলের স্বাদ পেতে সহায়তা করবে।

বইটিকে তথ্যবহুল করার স্বার্থে টীকায় অনুবাদকের পক্ষ থেকে তথ্যসূত্রগুলো উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে এবং সবশ্রেণির পাঠকের কথা বিবেচনা করে জটিল জায়গাগুলোকে সহজ করণার্থে এবং ব্যাখ্যাসাপেক্ষ কথাগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সংযুক্ত করার প্রয়োজনে আরও কিছু অতিরিক্ত টীকা যোগ করা হয়েছে। এ জন্য আমরা তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আল্লাহ এ বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রয়াসকে কবুল করুন।

- ইবনে মুশাররফ

সূচিপত্র

আলিমগণের দায়িত্ব

তাওহিদের প্রচার

হকপন্থী আলিমগণ নবিগণের উত্তরাধিকারী। বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

إِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

'নিশ্চয়ই আলিমগণ নবিগণের উত্তরাধিকারী। নবিগণ তো দিনার বা দিরহামের উত্তরাধিকার রেখে যান না। তারা উত্তরাধিকার রেখে যান ইলমের। সুতরাং যে তা ধারণ করল, সে পরিপূর্ণ অংশ লাভ করল।'[৮]

নবিগণের উত্তরাধিকার ও স্থলাভিষিক্ততা সে সময় যথার্থ ও পরিপূর্ণ হবে, যখন আলিমগণের জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু তা-ই হবে, যা সম্মানিত নবিগণের জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

কী ছিল জীবনের সেই অভীষ্ট লক্ষ্য?
কী ছিল চেষ্টা-প্রচেষ্টার সেই প্রত্যাশিত কেন্দ্রবিন্দু?
দু-শব্দে বললে তা ছিল 'বিশুদ্ধ দীন' আর এক শব্দে বললে তা ছিল 'তাওহিদ'।

তাওহিদের তত্ত্বকথা

'বিশুদ্ধ দীন' বা 'তাওহিদ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলার বিশুদ্ধ ইবাদত এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য—যা নিরেট তাঁরই প্রাপ্য—নিজ সত্তায় বাস্তবায়ন করা এবং অন্যদের মধ্যেও বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা-পরিশ্রম ব্যয় করা। আল-কুরআনের শাশ্বত ঘোষণা—

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

'জেনে রেখো, বিশুদ্ধ আনুগত্য কেবল আল্লাহরই জন্য।'[৯]

---

৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৬৮২; সুনানু আবি দাউদ : ৩৬৪১; সুনানু ইবনি মাজাহ : ২২৩; সহিহ ইবনু হিব্বান : ৮৮
৯. সুরা জুমার : ৩

وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

'এবং দীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য না হয়।'[১০]

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

'আপনার পূর্বে আমি যে রাসুলই প্রেরণ করেছি, তার প্রতিই এ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কোরো।'[১১]

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

'তিনিই সেই সত্তা, যিনি তার রাসুলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দীন (সর্বপ্রকার জীবনব্যবস্থা)-এর ওপর প্রবল করেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।'[১২]

তাওহিদের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

বিশুদ্ধ দীন বা তাওহিদ প্রতিষ্ঠার পথে কিছু প্রতিবন্ধক বিষয় রয়েছে। প্রতি যুগে যে বিষয়গুলো তার গতিরোধ করার জন্য বদ্ধপরিকর থাকে, সর্বদা তার পথচলা ব্যাহত করতে চায় এবং মুখের দুর্গন্ধময় ফুৎকারে তার আলো বিকিরণকারী প্রদীপকে নিভিয়ে দিতে চায়। সেই বিষয়গুলোকে মৌলিকভাবে চার ভাগে ভাগ করা যায়—

- শিরক
- কুফর
- বিদআত
- উদাসীনতা

---

১০. সুরা আনফাল : ৩৯
১১. সুরা আম্বিয়া : ২৫
১২. সুরা সফ : ৯
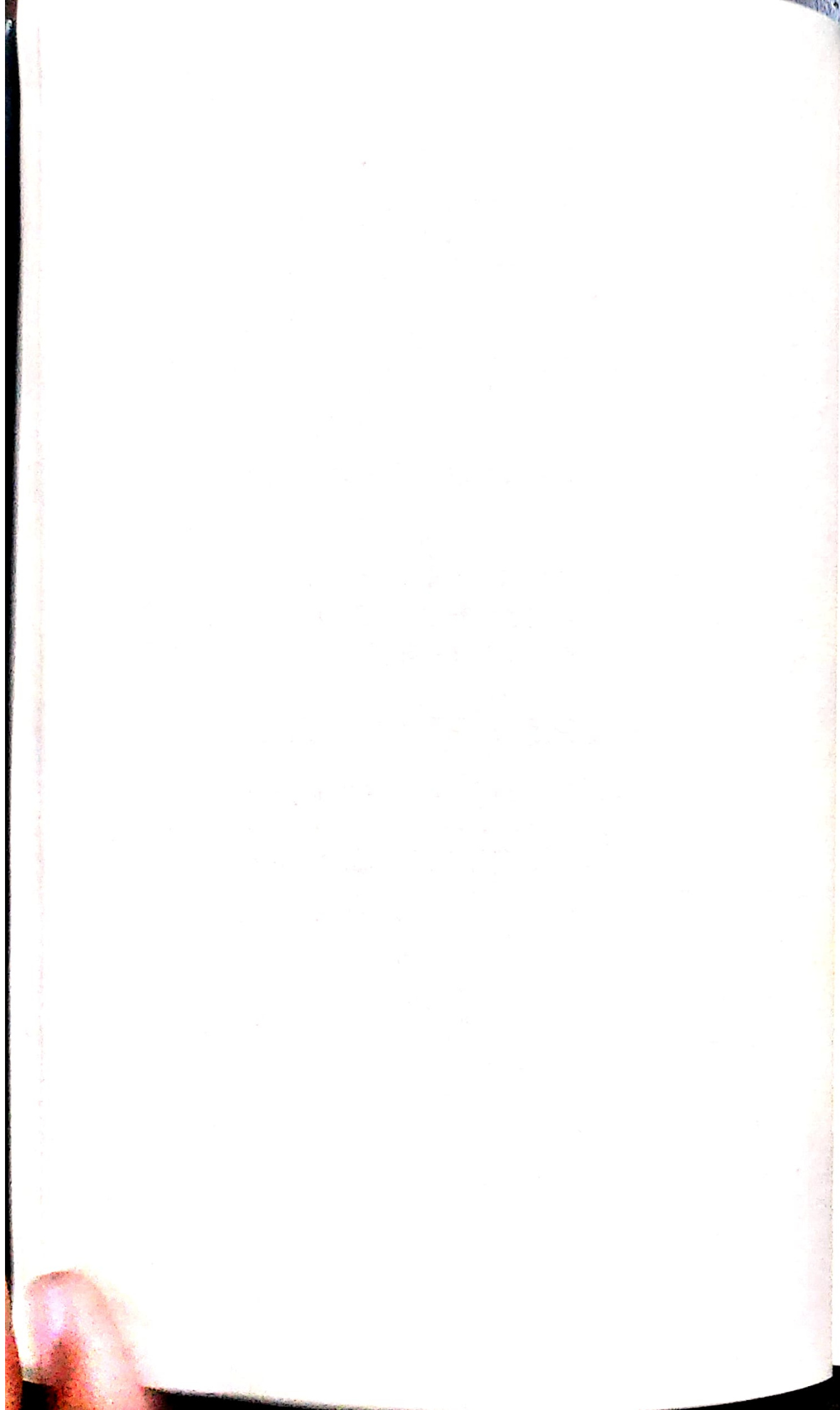
শিরক

শিরকের তত্ত্বকথা

শিরক বলা হয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে স্বাভাবিকতার ঊর্ধ্বে উপকার সাধনকারী বা অনিষ্টতাকারী হিসেবে বিশ্বাস করা। সৃষ্টিকুলের পরিচর্যা ও পরিচালনায় সেসব কিছুর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব স্বীকার করা।

মুখাপেক্ষিতা ও আশ্রয় গ্রহণ করা, ভয় ও আশা লালন করা এই আকিদার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ফলাফল এবং এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনুরূপভাবে দুয়া, সাহায্য প্রার্থনা ও বিনয় (যা ইবাদতের মূলকথা) এর অপরিহার্য প্রকাশিত রূপ।

শিরক এক স্বতন্ত্র দীন এবং পূর্ণাঙ্গ শাসনব্যবস্থা

শিরক এক স্বতন্ত্র দীন এবং পূর্ণাঙ্গ শাসনব্যবস্থা। কোনো মানুষের দেহে, মনে বা মস্তিষ্কে কিংবা পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ডে আল্লাহর দীন এবং শিরক কখনো একসঙ্গে বাস্তবায়িত হওয়া অসম্ভব। এই শিরকি দীন দেহ ও অন্তরের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে ততটুকু পরিসর পরিবেষ্টন করে, আল্লাহর দীনের জন্য কম করে হলেও যতটুকু পরিসর একান্ত প্রয়োজন।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

'মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে এমনভাবে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করে যে, তাদেরকে তারা ভালোবাসে আল্লাহর ভালোবাসার মতো। আর যারা ইমান এনেছে, তারা আল্লাহকেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসে।'[১৩]

تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

---

১৩. সুরা বাকারাহ : ১৬৫

‘আল্লাহর কসম, আমরা তো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে জগতসমূহের প্রতিপালকের সমকক্ষ স্থির করেছিলাম।’[১৪]

তাওহিদের বীজ শিরকের জমিতে চাষ হয় না

যতক্ষণ পর্যন্ত ভূমি থেকে শিরকের সকল শিকড় উৎপাটন না করা হবে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম সব কণা উপড়ে না ফেলা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দীনের বীজ বপন করা সম্ভব নয়। কারণ, তাওহিদের বীজ কখনো এমন কোনো জমিতে শিকড় গাড়ে না, যেখানকার মাটিতে অন্য কোনো বৃক্ষের শিকড় থাকে কিংবা অন্য কোনো বীজ থাকে। তাওহিদের শাখা-প্রশাখা তখনই আকাশ থেকে বর্ষিত বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হবে এবং দীনের এই বৃক্ষ তখনই ফল-ফুল প্রদান করবে, যখন তার শিকড় গভীরে প্রোথিত ও সুদৃঢ় হবে।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۞ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

‘আপনি কি দেখেননি, আল্লাহ কালিমা তায়্যিবার কেমন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন? তা এক পবিত্র বৃক্ষের মতো, যার মূল (ভূমিতে) সুদৃঢ়ভাবে স্থিত আর তার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত।[১৫] তা নিজ প্রতিপালকের নির্দেশে প্রতি মুহূর্তে ফল

১৪. সুরা শুআরা : ৯৭-৯৮

১৫. কালিমা তায়্যিবা দ্বারা তাওহিদের কালিমা অর্থাৎ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসির বলেছেন, ‘পবিত্র বৃক্ষ’ হলো খেজুর গাছ। খেজুর গাছের শিকড় মাটির নিচে অত্যন্ত শক্তভাবে গাড়া থাকে। তীব্র বাতাস বা ঝড়ো হাওয়া তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। এভাবেই তাওহিদের কালিমা যখন মানুষের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে যায় তখন ইমানের কারণে তার সামনে যতই কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদাপদ দেখা দিক না কেন, তাতে তার ইমানে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা সৃষ্টি হয় না। মহানবি ﷺ-এর সাহাবিগণকে কত রকমের কষ্টই না দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তাদের অন্তরে তাওহিদের যে কালিমা বাসা বেঁধেছিল, বিপদাপদের ঝড়-ঝঞ্ঝায় তাতে এতটুকু কাঁপন ধরেনি। আয়াতে খেজুর গাছের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে তার শাখা-প্রশাখা আকাশের দিকে বিস্তৃত থাকে এবং ভূমির মলিনতা থেকে দূরে থাকে। এভাবেই মুমিনের অন্তরে যখন তাওহিদের কালিমা বদ্ধমূল হয়ে যায় তখন তার সমস্ত শাখা-প্রশাখা অর্থাৎ সংকর্মসমূহ দুনিয়াদারির মলিনতা হতে মুক্ত থেকে আসমানের দিকে চলে যায় এবং আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছে তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল করে নেয়।

দেয়।[১৬] আল্লাহ (এ-জাতীয়) দৃষ্টান্ত দেন, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে।'[১৭]

এই বৃক্ষ অন্য কোনো বৃক্ষের ছায়ায় থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। এই বৃক্ষ যেখানে থাকে, একাকীভাবেই থাকে। তার প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য সীমানাহীন প্রান্তর প্রয়োজন।

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

'জেনে রেখো, বিশুদ্ধ দীন কেবল আল্লাহরই জন্য।'[১৮]

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনের প্রকৃতি এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত, সে এটাকে কোনো জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভূমিকে পুরোপুরি পরিষ্কার ও উপযোগী করে থাকে। সে খুঁজে খুঁজে শিরক ও জাহিলিয়্যাতের বৃক্ষমূল ও শিকড় বের করে আনে। এরপর তার প্রতিটা বীজ আলাদা আলাদা করে ছুড়ে ফেলে এবং পুরো জমিকে চষে ফেলে; যদিও এর জন্য তার দীর্ঘ সময় ব্যয় হয় এবং প্রচণ্ড কষ্ট ও শ্রম দেওয়ার প্রয়োজন হয়, যদিও তার রাতদিনের অবিরাম সাধনা এবং জীবনভর এই চেষ্টা-পরিশ্রমের ফসল হজরত নুহ আ.-এর মতো মাত্র গুটিকয়েক প্রাণের চাইতে অধিক না হয়, কিংবা যদিও তার সারাজীবনের পুঁজি কতক নবির মতো মাত্র এক জন ব্যক্তি হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও সে এই ফলাফলের ওপর সন্তুষ্ট এবং এই সাফল্যের ওপর আনন্দিত হয়। সে কখনো ফলাফল লাভ করার জন্য তাড়াহুড়া করে না। আর না কখনো অধৈর্যের সঙ্গে কার্য সম্পাদন করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে।

---

১৬. অর্থাৎ এ গাছ সর্বদা সজীব। কখনো পাতা ঝরে ন্যাড়া হয় না। সর্বাবস্থায় ফল দেয়। এর দ্বারা খেজুর গাছ বোঝানো হয়ে থাকলে এর অর্থ হবে, এর ফল সারা বছরই খাওয়া হয়। তা ছাড়া যে মওসুমে গাছে ফল থাকে না, তখনো তা দ্বারা বহুমাত্রিক উপকার লাভ হয়। কখনো তার রস আহরণ করা হয়। কখনো তার শাঁস বের করে খাওয়া হয়। তার পাতা দ্বারা বিভিন্ন রকমের জিনিস তৈরি করা হয়। এমনিভাবে যখন কেউ কালিমা তায়্যিবার প্রতি ইমান এনে ফেলে তখন সে সচ্ছল থাকুক বা অসচ্ছল, আরামে থাকুক বা কষ্টে, সর্বাবস্থায় ইমানের বদৌলতে তার আমলনামায় উত্তরোত্তর পুণ্য বাড়তে থাকে। ফলে তার পুরস্কারেও মাত্রা যোগ হতে থাকে, যা প্রকৃতপক্ষে তাওহিদি কালিমারই ফল।

১৭. সুরা ইবরাহিম : ২৪-২৫

১৮. সুরা জুমার : ৩

কুফর

কুফরের তত্ত্বকথা

কুফর হচ্ছে আল্লাহর দীন এবং তার শরিয়তকে অস্বীকার করা। এই অস্বীকৃতি মূলত আল্লাহর শাসনকর্তৃত্বের সঙ্গে বিদ্রোহ করা এবং তার বিধিবিধান প্রত্যাখ্যান করা; সেটা যেকোনো পন্থা বা নিদর্শনের মাধ্যমেই প্রকাশিত হোক না কেন।

শরিয়াহর বিধিবিধানের মৌখিক অথবা প্রায়োগিক অস্বীকার কুফর

উপরিউক্ত সংজ্ঞার মধ্যে এমন ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত, যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল ﷺ-এর বিধানসমূহের মধ্য থেকে কোনো বিধান মানে না, অথচ সে জানে যে, সেটা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের নির্দেশিত বিধান। একইভাবে যদি মৌখিক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না-ও করে, কিন্তু জেনেবুঝে তার বিরুদ্ধাচারণ করে, সে-ও একই পর্যায়ভুক্ত। এ-জাতীয় ব্যক্তি যদি শরিয়াহর অন্য সব বিধানের অনুসারীও হয়, তবুও এই সংজ্ঞার আওতা থেকে বহির্ভূত হবে না।

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

'তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ইমান রাখো আর কিছু অংশ অস্বীকার করো? তাহলে বলো, যারা এরূপ করে, তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, পার্থিব জীবনে তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনা আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে কঠিনতর আজাবের দিকে? তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন।'[১৯]

১৯. সুরা বাকারাহ : ৮৫

আল্লাহর শাসনাধিকারে অন্য কারও অংশীদারত্ব শিরক

একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রভুত্ব ও শাসনাধিকারের স্বীকৃতি প্রদানের দ্বারা স্বভাবতই প্রভুত্ব ও শাসনাধিকারের অন্য সব দাবিদারের প্রভুত্ব ও শাসনাধিকার অস্বীকৃত হয়ে যায়। কিন্তু যেই ব্যক্তি বাতিল উপাস্যদের প্রভুত্ব এবং শাসনাধিকারকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করতে প্রস্তুত হয় না, অন্য ভাষায় বললে—আল্লাহ তাআলার দিকে নিজেদের কিবলা স্থির করলেও অন্য সব কিবলার দিকে নিজেদের পিঠ ফিরাতে সম্মত হয় না, আল্লাহর দীনের মোকাবেলায় পৃথিবীতে যত সব শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আল্লাহর শরিয়াহর মোকাবেলায় যত সব আইনকানুন বাস্তবায়িত রয়েছে, সেসব থেকে বিমুখ হয় না; বরং কখনো কখনো সেগুলোর ওপর আমল করে নেয় এবং প্রয়োজনের সময় সেগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, এমন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।[২০]

আল্লাহর প্রতি ইমান আনয়নের জন্য তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক

আল্লাহর প্রতি ইমান আনয়নের জন্য তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা এটাকে ইমানের ওপর অগ্রবর্তী করেছেন।

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا

---

২০. মাওলানা তাকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) তার ইসলাম আওর সিয়াসি নজরিয়্যাত গ্রন্থে (পৃ. ১৪৭) লেখেন : 'শাসনাধিকারের অর্থ হলো অন্য কারও অনুসরণ ব্যতিরেকে বিধান প্রবর্তন এবং বিচারকার্য পরিচালনা করার সামগ্রিক অধিকার। এই অধিকার আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য সাব্যস্ত নয়। কেউ যদি এই অর্থে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে শাসক হিসেবে নির্ধারণ করে তবে প্রকৃতপক্ষে সে শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়।' ইসলামে আল্লাহর শাসনাধিকারের অর্থ স্পষ্ট করতে গিয়ে (পৃ. ১৭৫) লেখেন : 'এর সুস্পষ্ট অর্থ হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে যে হিদায়াত মানবজাতির কাছে পৌঁছিয়েছেন—তা কুরআনের মাধ্যমে হোক কিংবা হোক সুন্নাহর মাধ্যমে—এসবই ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রাথমিক উৎস। যেকোনো সরকার না এর বিপরীত কোনো আইন প্রবর্তন করতে পারে আর না অন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার রাখে।

‘যে ব্যক্তি তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর ওপর ইমান আনয়ন করে, নিশ্চয়ই সে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।’[২১]

তাগুতের পরিচয়

এ জন্য কুরআন এমন ব্যক্তিদের ইমানের দাবিকে মেনে নেয়নি, যারা মানবরচিত আইনকানুন, সেসবের প্রবক্তা এবং কেন্দ্রগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদেরকে নিজেদের বিচারক ও সালিস হিসেবে গ্রহণ করে। আল্লাহ বলেন—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

‘আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে, তারা আপনার প্রতি যে কালাম নাজিল করা হয়েছে, তার প্রতিও ইমান এনেছে এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল করা হয়েছিল তার প্রতিও; (কিন্তু) তাদের অবস্থা এই যে, তারা ফায়সালার জন্য তাগুতের কাছে নিজেদের মোকদ্দমা নিয়ে যেতে চায়? অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন সুস্পষ্টভাবে তাকে অস্বীকার করে। বস্তুত শয়তান তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে চরমভাবে গোমরাহ করতে চায়।’[২২]

---

২১. সুরা বাকারাহ : ২৫৬

২২. সুরা নিসা : ৬০। ইমাম তবারি রহ. বলেন—

‘আমার মতে তাগুতের সঠিক সংজ্ঞা হলো, তাগুত হলো সে, যে আল্লাহর ওপর সীমালঙ্ঘন করে। ফলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার উপাসনা করা হয়—তার পক্ষ থেকে উপাসনাকারীকে বাধ্য করার কারণে অথবা উপাসনাকারীর তার প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে। সেই উপাস্য হতে পারে মানুষ, শয়তান, মূর্তি, ভিন্ন কোনো পূজনীয় বস্তু অথবা অন্য যেকোনো কিছু।’ (তাফসিরে তাবারি : ৩/২১)

হাফিজ ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন—

‘তাগুত হলো উপাস্য, অনুসরণীয় কিংবা মান্যবর শ্রেণির মধ্য থেকে এমন কেউ, যার ব্যাপারে বান্দা তার বন্দেগির সীমা লঙ্ঘন করে। সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তাগুত হলো সেই ব্যক্তি, লোকেরা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের বিপরীতে যার কাছে বিচার প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাআলাকে ছেড়ে যার উপাসনা করে অথবা আল্লাহর বিধানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে যার অনুসরণ করে বা এমন বিষয়ে তার আনুগত্য করে, যে বিষয়ে তারা জানে না যে, এটাই আল্লাহর আনুগত্য।’ (ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন : ১/৫০)

জাহিলি আকিদা-বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজ কুফর

এই কুফরের দুর্গন্ধ সেসব লোকের থেকেও দূর হয়নি, যারা মুসলমানদের কাতারে শামিল হওয়ার পরও জাহিলিয়াত থেকে সরে আসেনি এবং জাহিলি আকিদা-বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেনি। তাদের অন্তর থেকে এখনো সেসব বিষয়ের প্রতি ঘৃণা ও অপছন্দনীয়তা দূর হয়নি এবং সেসব বিষয়ের হীনতা ও তুচ্ছতা বের হয়নি—জাহিলিয়াত যেগুলোকে মন্দ হিসেবে চিহ্নিত করে, জাহিলিয়াত যেগুলোকে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করে; যদিও সেই বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলার দীনে আকাঙ্ক্ষিত ও পছন্দনীয় হয়ে থাকে এবং যদিও সেই বিষয়গুলো আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর প্রিয় সুন্নাহ হয়ে থাকে।

একইভাবে তাদের অন্তর থেকে এখনো সেসকল আমল ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, প্রথা ও রীতির প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ দূর হয়নি, যেগুলো

উপরিউক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হাফিজ ইবনু কাসির রহ. বলেন—

'এ আয়াতটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন ব্যক্তির দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, যে দাবি করে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলের ওপর ও তাঁর পূর্ববর্তী নবিগণের ওপর যা অবতীর্ণ করেছেন, সে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে; অথচ সে বিবদমান বিষয়াদিতে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাহকে ছেড়ে ভিন্ন কোনো কিছুর কাছে বিচার-ফায়সালা চায়। ...এ আয়াতটি প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে তিরস্কার করছে, যে কুরআন-সুন্নাহ থেকে ফিরে যায় এবং এ দুটো ব্যতিরেকে অন্য কোনো বাতিলের কাছে বিচার প্রার্থনা করে। (আর যার কাছে বিচার প্রার্থনা করে,) এ আয়াতে তাগুত দ্বারা সে-ই উদ্দেশ্য।' (তাফসিরে ইবনে কাসির : ২/৩৪৬)

উপরিউক্ত আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার বিধানকে পেছনে ফেলে ভিন্ন কোনো বিধান দ্বারা বিচার-আচার করে, সে তাগুত। আর যারা এতটুকুতেই ক্ষ্যান্ত থাকে না, বরং মহান প্রতিপালকের বিধানগুলোকে পরিবর্তন করে নিজেরাই বিধান রচনা করে, রাষ্ট্রে সে বিধানই বাস্তবায়ন করে, আল্লাহর বান্দাদের সে বিধান মানতে বাধ্য করে, তার বিধান মেনে না নিলে কঠোর শাস্তি প্রদান করে, তারা তো সাধারণ পর্যায়ের তাগুতই শুধু নয়; বরং তারা হলো চরম পর্যায়ের তাগুত।

সুতরাং যেসব শাসক ও বিচারক কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত বিচার-আচার করে, সুদের প্রচলন ঘটায়, মদ ও ব্যভিচারের লাইসেন্স দেয়, কুরআনে বর্ণিত দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকে; বরং কুরআন-সুন্নাহর আইনকে সেকেলে মনে করে, কখনো-বা মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলে তামাশা করে, মানুষের ওপর গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের মতো সুস্পষ্ট কুফরি বিধান চাপিয়ে দেয় আর যারা পার্থিব স্বার্থে বিক্রিত হয়ে তাদের ইলমকে এসকল কুফরের সেবায় নিয়োজিত করে, মানুষকে নিজেদের ইলম দ্বারা বিভ্রান্ত করে, এদের প্রত্যেকেই তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। বিশুদ্ধ ইমানের জন্য যেহেতু তাগুতকে বর্জন করা শর্ত, তাই উপরিউক্ত তাগুত গোষ্ঠীর থেকে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। তাদের প্রত্যেকের বিরোধিতা করতে হবে। তাদের প্রতি অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে। তাদের সঙ্গে এমন কোনো আচরণ করা যাবে না, যা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। বরং ইবরাহিম আ.-এর মতো স্পষ্ট ভাষায় সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিতে হবে।

জাহিলিয়াতের ধারকদের নিকট পছন্দনীয় ও সম্মানিত; যদিও তা আল্লাহ তাআলার শরিয়তে অপছন্দনীয় এবং হীন।

জাহিলি সহমর্মিতা ও সাম্প্রদায়িকতা

একইভাবে যাদের অন্তর থেকে এখনো জাহিলি সহমর্মিতা ও সাম্প্রদায়িকতা দূর হয়নি, যাদের কার্যকলাপ এখনো সেই আরব্য জাহিলিয়াত (বরং প্রকৃতপক্ষে সকল জাহিলিয়াত)-এর সেই গৃহীত ও স্বীকৃত মূলনীতি অনুসারে হয়ে থাকে যে, 'তুমি তোমার ভাইকে সর্বাবস্থায় সাহায্য করো—সে জালিম হোক কিংবা মাজলুম', তারাও একই পর্যায়ভুক্ত।

এরচে অধিক জটিল ব্যাপার হলো, ইসলাম গ্রহণ করার পরও, অন্য ভাষায় মুসলিম পরিচয়ে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তার কাছে উত্তম-অনুত্তমের মানদণ্ড তা-ই হয়, যা হয়ে থাকে নিরেট জাহিলিয়াতে। তার দৃষ্টিতে যেকোনো বিষয়ের মূল্যায়ন সেই মাপকাঠির আলোকেই হয়, যা জাহিলিয়াত নির্ধারণ করে দিয়েছে। মানবজীবনের সেসব মূল্যবোধ ও মানদণ্ডের প্রতিই তার অন্তরে শ্রদ্ধাবোধ থাকে, যেগুলোকে জাহিলিয়াত স্বীকৃতি দিয়ে থাকে।

ইসলামের বিশুদ্ধতার নিদর্শন হলো, ইমানের প্রতি ভালোবাসা, কুফর ও জাহিলিয়াতের প্রতি ঘৃণা

ইসলামের বিশুদ্ধতার নিদর্শন হলো, কুফর ও তার পুরো পরিসর, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত সবকিছু, তার সকল বৈশিষ্ট্যাবলি এবং প্রতীকের প্রতি অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি হবে। কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং তাতে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার কল্পনাও তার কাছে কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। ইমানের পরিপক্কতার নিদর্শন হলো, মানুষ কুফরের সাধারণ থেকে অতি সাধারণ কাজের মোকাবেলায় মৃত্যুকে অধিক পছন্দ করবে। সহিহ বুখারির হাদিস—

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ

إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

'তিনটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে, সে ইমানের মিষ্টতা অনুভব করবে—

১. আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল অন্য সবকিছু অপেক্ষা অধিক প্রিয় হবে,
২. যে-কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে,
৩. কুফরে প্রত্যাবর্তন করা তার কাছে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চাইতেও অসহনীয় হবে।'[২৩]

সাহাবিগণের অবস্থা এমনই ছিল। তাদের অন্তরে পূর্বের জীবন তথা জাহিলিয়াতের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল। তাদের কাছে জাহিলিয়াতের চাইতে বড় কোনো অপমানকর বিষয় ছিল না। তারা যখন ইসলাম গ্রহণের পূর্বের অবস্থার কথা স্মরণ করতেন তখন নেহাত লজ্জাবোধ এবং ঘৃণার সঙ্গে সেগুলো উল্লেখ করতেন। জাহিলি সময়কার সকল কথাবার্তা, কাজকর্ম, চারিত্রিক গুণাগুণ এবং কুফর, পাপাচার ও আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার প্রতি তাদের শুধু শরয়ি ও যৌক্তিক ক্রোধই শুধু নয়, বরং স্বভাবজাত ঘৃণা ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের এই গুণের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন—

وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

'আল্লাহ তো তোমাদের অন্তরে ইমানের ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে আকর্ষণীয় করে দিয়েছেন। আর তোমাদের কাছে কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে ঘৃণ্য বানিয়ে দিয়েছেন।'[২৪]

---

২৩. সহিহ বুখারি : ১৬
২৪. সুরা হুজুরাত : ৭

আল্লাহর বিধানের ওপর আচারপ্রথার অগ্রাধিকার জাহিলিয়াতের নিদর্শন

জাহিলিয়াতের একটি নিদর্শন হলো, যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল ﷺ-এর কোনো বিধান শোনানো হয় তখন পুরোনো রসম-রেওয়াজ ও পূর্বপুরুষের আচারপ্রথার কথা বলে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল ﷺ-এর বিধিবিধানের মোকাবেলায় পূর্বের জামানা ও প্রাচীনকালের সংবিধানের দোহাই তুলে ধরে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

'যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা কিছু নাজিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে যে আদর্শের ওপর পেয়েছি তার অনুসরণ করব; যদিও তাদের পূর্বপুরুষ কিছুই বুঝত না এবং তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত ছিল না।'[২৫]

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ

'না, বরং তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এই মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরা তাদের পদছাপ ধরে সঠিক পথেই চলছি।'[২৬]

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ

'তারা বলল, হে শুয়াইব, তোমার নামাজ কি তোমাকে এই আদেশ করে যে, আমাদের বাপ-দাদা যা কিছুর উপাসনা করত, আমরা তা সব পরিত্যাগ করব এবং আমরা আমাদের সম্পদে যাচ্ছেতাই হস্তক্ষেপ করা পরিহার করব?'[২৭]

---

২৫. সুরা বাকারাহ : ১৭০

২৬. সুরা জুখরুফ : ২২

২৭. সুরা হুদ : ৮৭

ইসলাম আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ আনুগত্য

সুতরাং এমন সব লোক জাহিলিয়াত ত্যাগ করে ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করেনি, যারা আল্লাহ তাআলার বিপরীতে সবকিছুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেনি এবং নিজেদেরকে আল্লাহ তাআলার দিকে পরিপূর্ণ অভিমুখী করেনি। এই পূর্ণাঙ্গ সম্পর্কচ্ছেদ ও পরিপূর্ণ অভিমুখিতাই সেই ইসলাম, ইবরাহিম আ. যার ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি সেটাকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। ইরশাদ হয়েছে—

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

'যখন তার প্রতিপালক তাকে বললেন, "আনুগত্যে নতশির হও" তখন সে (সঙ্গে সঙ্গে) বলল, "আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের (প্রতিটি হুকুমের) সামনে মাথা নত করলাম।'[২৮]

একই আদেশ সকল মুসলমানকেই দেওয়া হয়েছে—

فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا

'তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। সুতরাং তার সামনে আনুগত্যে নতশির হও।'[২৯]

যদি এই আদর্শ বাস্তবায়ন না করা হয় তবে সেটা আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার নামান্তর। এ জন্য এই পরিপূর্ণ ইসলামকে এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা 'সিলমুন' শব্দে উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ এটা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সন্ধিস্বরূপ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

'হে ইমানদাররা, তোমরা সন্ধিতে (ইসলামে) পরিপূর্ণ প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'[৩০]

---

২৮. সুরা বাকারাহ : ১৩১
২৯. সুরা হজ : ৩৪
৩০. সুরা বাকারাহ : ২০৮

জাহিলিয়াতের পুরোনো ও নতুন প্রকারভেদ

স্মর্তব্য যে, জাহিলিয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য নবি ﷺ প্রেরিত হওয়ার পূর্বে আরবজাতির জীবনাচারই শুধু নয়; বরং প্রত্যেক এমন অনৈসলামিক জীবন ও ব্যবস্থা, যার উৎসমূল ওহি, নবুওয়াত, আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসুলের সুন্নাহ না হবে এবং যা ইসলামের মাসায়িল ও আহকামে জিন্দেগির সঙ্গে অসমঞ্জস হবে—সেটা আরব্য জাহিলিয়াতই হোক কিংবা হোক ইরানের মাজদাকি সভ্যতা, সেটা হিন্দুস্তানের ব্রাহ্মণ্যবাদই হোক কিংবা হোক মিশরের ফিরআউনি ব্যবস্থা, সেটা তুর্কিদের তুরানি আদর্শই হোক কিংবা হোক বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা, অথবা সেটা হোক মুসলমানদের শরিয়াহ-বিবর্জিত জীবনধারা এবং তাদের শরিয়াহর সঙ্গে বিরোধপূর্ণ আচারপ্রথা, চরিত্র ও অভ্যাস, ঝোঁক ও প্রবণতা; এমনকি হোক সেটা নতুন বা পুরোনো, অতীত বা বর্তমান।

কুফর এক স্বতন্ত্র দীন

কুফর শুধু একটি নেতিবাচক বিষয়ই নয়; বরং তা একটি হ্যাঁ-সূচক ও ইতিবাচক বিষয়ও। কুফর শুধু আল্লাহর দীন অস্বীকারের নামই নয়; বরং তা একটি ধর্মীয় ও চারিত্রিক ব্যবস্থা এবং স্বতন্ত্র একটি ধর্ম; যার মধ্যে রয়েছে নিজস্ব ফরজ ও ওয়াজিব, মাকরুহ ও হারাম। তাই এ দুই ধর্ম এক আধারে একত্রিত হতে পারে না। একজন মানুষ একই সময়ে দুই ধর্মের প্রতি আনুগত্যপরায়ণ হতে পারে না।

কুফরের ক্ষেত্রে কোনো শিথিলতা নেই

নবিগণ সর্বদা কুফরকে সমূলে বিনাশ করতেন। তারা কুফরের বেলায় কখনো শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা সমন্বয় সাধনের চিন্তা করতেন না। কুফর চেনার জন্য তাদের ছিল সুগভীর যোগ্যতা ও প্রখর দূরদৃষ্টি। এ ক্ষেত্রে তাদের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা ছিল অনন্যসাধারণ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাদের পরিপূর্ণ হিকমত এবং আপসহীন মানসিকতা দান করেছেন। তাদের স্রষ্টাপ্রদত্ত এই দূরদর্শিতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ওপর নির্ভরতার কোনো বিকল্প নেই। কুফর ও ইসলামের যে সীমারেখা তারা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন, এর যে নিদর্শন তারা চিহ্নিত করে

দিয়েছেন, সেগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ ব্যতিরেকে দীনের হেফাজত সম্ভবও নয়। এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিথিলতা ও আপসকামিতা দীনকে এতটা বিকৃত করে ফেলে, যতটা বিকৃত হয়েছে ইহুদিধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম এবং হিন্দুস্তানের ধর্মসমূহ।

আলিমগণ কুফরের বিরুদ্ধে সর্বদা সরব

নবিগণের প্রকৃত অনুসারীরা কুফরের ক্ষেত্রে তাদেরই দূরদর্শিতা ও আপসহীন মানসিকতা লালন করেন। তারা কুফরের একেকটা নিদর্শন নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং জাহিলিয়াতের একেকটা দাগ ধুয়ে ফেলেন। কুফর চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তাদের অনুভূতিশক্তি সাধারণ মানুষের চাইতে অনেক বেশি হয়ে থাকে। কুফর যেই পোশাকে এবং যেই রূপেই আসুক না কেন, তারা সেটাকে ঠিকঠিকই চিনে ফেলেন এবং তার বিরুদ্ধাচারণে সর্বশক্তি ব্যয় করে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি—

- হিন্দুস্তানের মতো রাষ্ট্রে বিধবাদের দ্বিতীয় বিয়েকে হারাম মনে করা এবং এর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা লালন করার মধ্যে তাদের কুফরের দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। তারা এই বিষয়টিকে প্রচলন দেওয়ার জন্য এবং এই সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করার জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। এমনকি কোনো কোনো সময় এর জন্য নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মুখেও ঠেলে দেন।

- কোথাও শরিয়াহর আইনকানুনের ওপর আচারপ্রথার প্রাধান্য এবং বোনদের মিরাস না দিতে বাধ্য করার বিষয়টি তাদের কাছে কুফর মনে হয়। ফলে তারা এসব লোকের বিরুদ্ধাচারণ এবং তাদের বয়কট করাকে অপরিহার্য কর্তব্য মনে করেন।

- কখনো আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট বিধান শোনার পরও তা না মানা, আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য বিধানের আলোকে পরিচালিত আদালত এবং মানবরচিত আইনকানুনের কোলে আশ্রয় নেওয়া এবং অনৈসলামিক বিধিবিধান ও আইনকানুন বাস্তবায়ন করা তাদের কাছে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সমার্থক মনে হয়। ফলে অপারগতার ক্ষেত্রে তারা সেই ভূমি থেকে হিজরত করেন।

- কখনো তারা নওমুসলিম অথবা এমন মুসলমান, যে অমুসলিমদের সাহচর্যে অবস্থান করে এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে—তাদের জবাইকৃত পশু ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। এমন সব বস্তুর প্রতি ঘৃণা লালন করেন, যেগুলোর প্রতি ঘৃণা লালন করা থেকে তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী এবং দেশবাসী কঠিনভাবে বিরত থাকে। উল্টো বরং তাদের মধ্যে খোদ তার ব্যক্তিত্বের প্রতি ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণা ব্যাপক হয়ে থাকে। এসব কিছুর মধ্যে দেশবাসীর ইমানের দুর্বলতা, পুরোনো ধর্ম অথবা অমুসলিমদের সাহচর্যের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।

- কখনো কোনো অবস্থায় বা কোনো জায়গায় একটি সুন্নত, জায়িয ও মুস্তাহাব বিষয়কে তারা ওয়াজিব এবং ইসলামের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করেন।

- কখনো তারা অমুসলিমদের আচারপ্রথা, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, বেশভূষা ও পোশাক-আশাক গ্রহণ করা এবং তাদের সাদৃশ্য ধারণ করার ব্যাপারে কঠোরভাবে বিরোধিতা করেন।

- কখনো তারা অমুসলিমদের উৎসব-আনন্দ, আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নিষেধ করেন।

মোদ্দাকথা, জাহিলিয়াতপ্রীতি অথবা তার সহায়তা যে পোশাকে এবং যে আকৃতিতেই প্রকাশিত হতো, জাহিলিয়াতের আত্মা যে দেহের মধ্যেই প্রবিষ্ট হয়ে সামনে আসত, তারা তৎক্ষণাৎ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন। এ ক্ষেত্রে তাদের কোনো বিভ্রম হতো না। জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধাচারণ করার ক্ষেত্রে কোনো স্বার্থ বা কল্যাণকামিতা তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত না। তারা জাহিলিয়াতকে সম্বোধন করে বলতেন—

যে বেশ ধরেই আসো তুমি,
নেই তো মানা।
তোমার দেহের গড়ন-গঠন—
সে তো আমার খুব জানা।

আলিমদের সঙ্গে নিম্ন মানসিকতাধারীদের আচরণ

তাদের সঙ্গে নিম্ন মানসিকতা ও হীন চিন্তাচেতনা লালনকারীরা বিদ্রূপের আচরণ করে, তাদের নিয়ে হাসিতামাশা করে; অথচ সে সকল লোকের অবস্থা হলো, তারা নিজেরা ইসলাম এবং অন্য সব ধর্মকে সমমর্যাদা প্রদান করে। অমুসলিমদের ইবাদতখানা আর হারাম শরিফকে একই পর্যায়ভুক্ত গণ্য করে। সম্মানিত কাবা এবং মূর্তিপূজার উপাসনালয়ের মধ্যে পার্থক্য করাকে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড মনে করে। তারা হকপন্থী আলিমদেরকে তাচ্ছিল্য করার জন্য তাদের ব্যাপারে 'নগরের ফকিহ', 'বিচারক', 'সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি লালনকারী বক্তা' এবং 'খোদায়ি সেনা' ইত্যাদি উপাধি প্রয়োগ করে। এতদ্‌সত্ত্বেও নবিগণের উত্তরসূরিরা পরিপূর্ণ আত্মপ্রশান্তি এবং স্বনির্ভরতার সঙ্গে নিজেদের কাজ ঠিকই চালিয়ে যান। আদতে এটা তো নির্দ্বিধ সত্য ও সন্দেহাতীত বাস্তবতা যে, প্রত্যেক যুগে নবিগণের দীনের সুরক্ষা এই আলিমরাই দিয়েছেন। আজ ইহুদিধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে আলাদারূপে ইসলামের যে রূপ পরিদৃষ্ট হচ্ছে, এটা তাদেরই দৃঢ় প্রত্যয়, অবিচলতা এবং সুদৃঢ় সুগভীর জ্ঞানের ফলাফল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইসলাম, ইসলামের নবি ও তার ধারক-বাহকদের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। বস্তুত তারা আমাদের থেকে মুখে ও কর্মে তাদের ব্যাপারে এই নির্দ্বিধ স্বীকারোক্তি পাওয়ার দাবি রাখেন—

রঙিন যত রক্তজবা
মোদের দিলের রুধির-সেঁচা;
কীর্তি মোদের মরুর বুকে
ফুল ফোটানোর বিধান রচা।
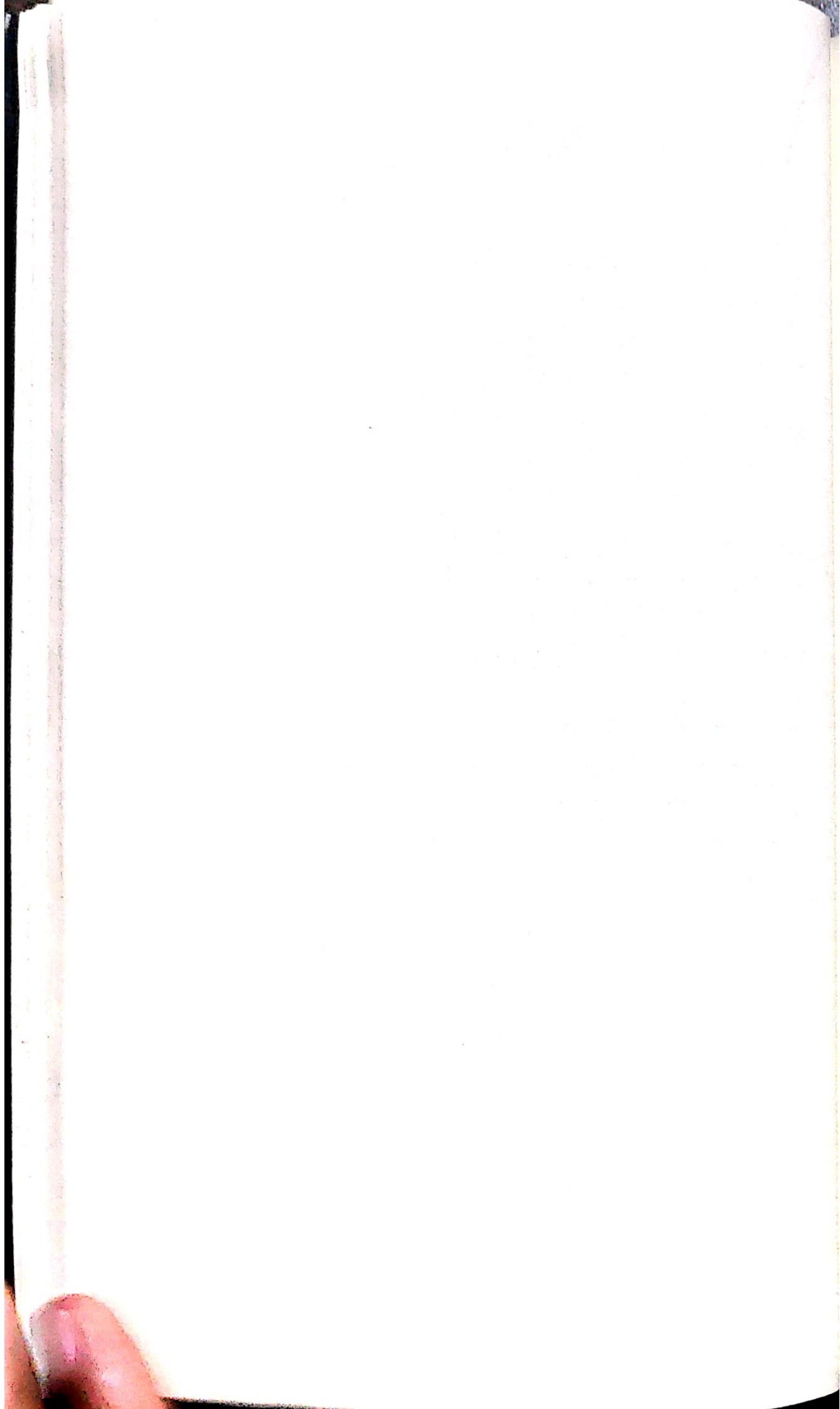
বিদআত

বিদআতের তত্ত্বকথা

এমন কোনো বিষয়, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল যেটাকে দীনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেননি এবং যার আদেশও দেননি, সেটাকে—

- দীনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা,
- দীনের একটি অংশ বানিয়ে ফেলা,
- সওয়াব লাভের নিমিত্তে এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য পালন করা,
- তার বানোয়াট রূপ অথবা পারিভাষিক আকৃতি এবং তার জন্য নির্ধারিত শর্ত ও শিষ্টাচারের প্রতি সেভাবে যত্নবান হওয়া, যেভাবে কোনো শরয়ি বিধানের প্রতি যত্ন নেওয়া হয়ে থাকে,

এমন সব বিষয়ই বিদআত।

শিরক, কুফর ও বিদআতের পারস্পরিক সম্পর্ক

শিরক ও কুফর যেমনিভাবে এক স্বতন্ত্র দীন, বিদআতও তেমনি এক স্বতন্ত্র শরিয়াহ। ইসলামের মোকাবেলায় শিরক ও কুফর যদি বহিরাগত বিষয় হয়ে থাকে তবে বিদআতও আল্লাহ তাআলার প্রণয়ন করা দীনে মনুষী শরিয়াহর গঠিত এক রূপ, যা ভেতরে ভেতরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এমনকি কোনো কোনো সময় (যদি সেটাকে স্বাধীনভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় তবে) মূল শরিয়াহর স্থলে ক্রমশ নিজের স্থান করে নেয় এবং একপর্যায়ে শরিয়াহর পুরো পরিসর এবং মানুষের সবগুলো সময়কে পরিব্যাপ্ত করে নেয়।[৩১]

---

৩১. স্মর্তব্য যে, এখানে সায়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.-এর উদ্দেশ্য কেবল বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে চিত্রায়িত করা। এটা শিরক ও বিদআতের নতুন কোনো সংজ্ঞায়ন নয়। এ বিষয়টি তো বর্ণনার আলোকেই প্রমাণিত যে, বিদআত মৌলিকভাবে দুই প্রকার : (ক) বিদআতে মুকাফফিরাহ বা বিদআতে শিরকিয়্যাহ, (খ) বিদআতে গাইরে মুকাফফিরাহ বা বিদআতে গাইরে শিরকিয়্যাহ। অর্থাৎ বিদআতের উপরিউক্ত সংজ্ঞায় নতুন বিষয় শরিয়াহর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার যে কথা উল্লেখিত হয়েছে, সেই বিষয়টি যদি শিরকি ও কুফরি কর্মকাণ্ডের আওতাভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে সেটা বিদআতও, আবার কুফরও। পরিভাষায় যেটাকে বিদআতে মুকাফফিরাহ বলা হয়। একইভাবে যখন তা শিরকি ও কুফরি কর্মকাণ্ডের আওতাভুক্ত হবে না তখন সেটাকে

বিদআত এক স্বতন্ত্র শরিয়াহ

এই শরিয়াহর ফিকহ আলাদা। এর ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব আলাদা। এমনকি অনেক সময় এর বিধানের সংখ্যা শরিয়াহর বিধানের চাইতে ঢের বেশি হয়ে থাকে।

শরিয়াহ প্রণয়ন ও আইনকানুন রচনা আল্লাহর অধিকার

বিদআত সর্বপ্রথম এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে যে, শরিয়াহ প্রণয়ন ও আইনকানুন রচনা আল্লাহর অধিকার। কোনো বিষয়কে আইনের রূপ দেওয়া, সেটাকে মান্য করা সবার ওপর অবধারিত করে দেওয়া—এই মর্যাদা কেবল শরিয়াহ প্রণেতা আল্লাহরই জন্য। মানুষের হাতে আইন প্রণীত হওয়া আল্লাহ তাআলার এই মর্যাদার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ। এ জন্য আইন প্রণয়নকারী মানুষকে তাগুত বলা হয়।

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ

‘তাদের অবস্থা এই যে, তারা ফায়সালার জন্য তাগুতের কাছে নিজেদের মোকদ্দমা নিয়ে যেতে চায়? অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন সুস্পষ্টভাবে তাকে অস্বীকার করে।’[৩২]

বিদআত সৃষ্টি শরিয়াহ প্রণয়নের নামান্তর

কোনো বিষয়কে দীন ও শরিয়াহ আখ্যা দেওয়া, সেটাকে বিশেষ রূপ ও শর্তের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য এবং সাওয়াব ও প্রতিদান লাভের পন্থা হিসেবে স্থির করা তো এর চাইতেও জঘন্য ও ভয়াবহ ব্যাপার। এটা তো শরিয়াহ

বিদআতে গাইরে মুকাফফিরাহ বলা হবে। এখানে বিদগ্ধ লেখক শিরক ও কুফরের মোকাবেলায় বিদআতের পরিচয় স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। আর এই স্পষ্টকরণের স্বার্থেই তিনি বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করেছেন—‘শিরক ও কুফর যেমনিভাবে এক স্বতন্ত্র দীন, বিদআতও তেমনি এক স্বতন্ত্র শরিয়াহ।’

৩২. সুরা নিসা : ৬০

প্রণয়নেরই নামান্তর। অথচ কুরআন বলে যে, দীন ও শরিয়াহ প্রণয়ন করা একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাজ।

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

'তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেই পন্থাই স্থির করেছেন, যার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি নুহকে এবং যা আমি ওহির মাধ্যমে আপনার কাছে পাঠিয়েছি।'[৩৩]

আরববাসীর শরিয়াহ প্রণয়ন

আরববাসীরা যখন নিজেদের থেকে বৈধতা-অবৈধতা আরোপের কাজ শুরু করল এবং স্বতন্ত্র বিধিবিধান জারি করতে লাগল তখন কুরআন তাদের ব্যাপারেও এই সমালোচনা করল—

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

'তাদের কি এমন শরিক আছে, যারা তাদের জন্য এমন দীন স্থির করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?'[৩৪]

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

'তারা বলে, এই সব গবাদি পশু ও শস্যতে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আছে। তাদের ধারণা এই যে, আমরা যাদের ইচ্ছা করব তারা ছাড়া অন্য কেউ এসব খেতে পারবে না এবং কতক গবাদি পশু এমন, যাদের পিঠকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কিছু পশু এমন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তার জবাইকালে আল্লাহর নাম নেয় না। এসব মিথ্যা রচনার প্রতিফল তিনি শিগগিরই তাদের প্রদান করবেন।'[৩৫]

---

৩৩. সুরা শুরা : ১২

৩৪. সুরা শুরা : ২১

৩৫. সুরা আনআম : ১৩৮

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

'তারা আরও বলে, এই বিশেষ গবাদি পশুর গর্ভে যে বাচ্চা আছে, তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের নারীদের জন্য হারাম। আর তা যদি মৃত হয় তবে তাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে (নারী-পুরুষ) সকলে অংশীদার হতো। তারা যেসব কথা তৈরি করছে, শীঘ্রই আল্লাহ তাদেরকে তার প্রতিফল দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী।'[৩৬]

আরববাসীর এই শরিয়াহ প্রণয়নের অপরাধ—কুরআন যেটাকে আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ রটনা শব্দে উল্লেখ করল—আদতে কী ছিল? তা তো এটাই ছিল যে, তারা কোনো আসমানি যোগসূত্র ও ওহির ওপর নির্ভরতা ব্যতিরেকে কেবল নিজেদের ঐকমত্য এবং কিছু পরিভাষার ভিত্তিতে কোনো বস্তুকে একজনের জন্য হালাল এবং অন্যজনের জন্য হারাম করে দিয়েছিল। আর তারা এর জন্য মূলনীতি ও বিধিবিধান, উসুল ও নীতিমালা স্থির করে রেখেছিল—যেগুলোর জন্যও কোনো আসমানি তথ্যসূত্র ছিল না। এরপরও তারা সে বিষয়গুলো নিজেরাও এমনভাবে মান্য করেছে এবং অন্যদেরকেও মান্য করতে বাধ্য করছে, যেভাবে নবিগণের শরিয়াহ এবং আল্লাহ তাআলার অবতীর্ণ বিধিবিধান মান্য করা হয়। কেউ যদি এগুলোর অন্যথা করত তাহলে তাকে অপরাধী বিবেচনা করা হতো এবং তাকে নিন্দা ও শাস্তির সম্মুখীন হতে হতো।[৩৭]

---

৩৬. সুরা আনআম : ১৩৯

৩৭. শহিদ সায়্যিদ কুতুব রহ. বলেন,'আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের একটি হলো হাকিমিয়্যাহ। যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য আইন প্রণয়ন করে তখনই সে নিজেকে আল্লাহর বদলে এমন আরেক প্রভুর ভূমিকাতে বসিয়ে নেয়, যার আইনের আনুগত্য ও অনুসরণ করা হয়। আর যারা এই এক আইনপ্রণেতা বা অনেকজন আইনপ্রণেতার আনুগত্য করে, তারা আল্লাহর গোলামের পরিবর্তে আইনপ্রণেতাদের গোলামে পরিণত হয়। তারা অনুসরণ করে আইনপ্রণেতাদের রচিত দীনের; আল্লাহ তাআলার মনোনীত দীন ইসলামের নয়। জেনে রাখুন আমার ভাইয়েরা, এটা আকিদার ক্ষেত্রে সবচে বড় বিপর্যয়। এটা হলো ইবাদত ও দাসত্বের প্রশ্ন। এটা হলো ইমান ও কুফরের প্রশ্ন। জাহিলিয়্যাত ও ইসলামের পশ্ন। জাহিলিয়্যাত কোনো নির্দিষ্ট সময় বা যুগ নয়; জাহিলিয়্যাত হলো একটি অবস্থা।' (তাফসির ফি জিলালিল কুরআন)

কিতাবিরা নিজেদের আলিমদেরকে শরিয়াহ প্রণেতা বানিয়ে নিয়েছিল

ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের এই অপরাধের কথাই কুরআন বর্ণনা করেছে—

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

'তারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের ধর্মগুরু ও বৈরাগীদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে এবং মারয়াম তনয় ইসাকেও। অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করার হুকুম দেওয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তাদের অংশীবাদীসুলভ কথাবার্তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র।'[৫৮]

রাসুলুল্লাহ ﷺ আদি ইবনু হাতিম রা.-এর সামনে এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে এ বিষয়টিই উল্লেখ করেছেন যে, খ্রিষ্টান আলিম ও শাইখরা যে বস্তুকে তাদের জন্য হালাল অথবা হারাম বলে আখ্যায়িত করত, তারা বিনা বাক্য ব্যয়ে সেটাকে মেনে নিত এবং সেটাকে স্বতন্ত্র শরিয়াহ হিসেবে গ্রহণ করত।[৫৯]

---

৫৮. সুরা তাওবা : ৩১। আল্লাহকে রব বানানোর যে ব্যাখ্যা নবিজি ﷺ করেছেন, তার সারমর্ম এই যে, তারা তাদের ধর্মগুরুদেরকে বিপুল ক্ষমতা দিয়ে রেখেছিল। ফলে তারা তাদের ইচ্ছামতো কোনো জিনিসকে হালাল এবং কোনো জিনিসকে হারাম ঘোষণা করতে পারত। প্রকাশ থাকে যে, যারা সরাসরি আসমানি কিতাবের জ্ঞান রাখে না, শরিয়াহর বিধান জানার জন্য সেই আম সাধারণকে আলিম-উলামার শরণাপন্ন হতেই হয় এবং আল্লাহ তাআলার বিধানের ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে তাদের কথা মানতেও হয়। খোদ কুরআন মাজিদই এ নির্দেশ প্রদান করেছে। (দ্রষ্টব্য—সুরা নাহল : ৪৩; সুরা আম্বিয়া : ৭) এতটুকুর মধ্যে তো আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা এতটুকুতেই ক্ষান্ত ছিল না। তারা আরও অগ্রসর হয়ে তাদের ধর্মগুরুদের বিধান তৈরি করার এখতিয়ার প্রদান করেছিল। ফলে তারা কেবল আসমানি কিতাবের ব্যাখ্যা হিসেবেই নয়; বরং নিজেদের ইচ্ছামতো কোনো জিনিসকে হালাল এবং কোনো জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করতে পারত; তাতে তাদের সেই বিধান আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থীই হোক না কেন। হাদিসের ঘোষণা অনুযায়ী যেহেতু এই উম্মাহ সেই পূর্ববর্তী ইহুদি-খ্রিষ্টানদের পদে পদে অনুসরণ করবে, তাই আজকাল অনেক মুসলমানের মধ্যেও এই জঘন্য কাজের চর্চা দেখা যায়। বিশেষ করে মানুষের কাছে স্বভাবগতভাবে ইসলামের যেসকল বিধান পালন করা কঠিন ও অপছন্দনীয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে অনেক মুসলমানই এই কাজটা করে থাকে।

৫৯. হাদিস শরিফে এসেছে—

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ)، قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ

'আল্লাহ যে শরিয়াহর অনুমোদন দেননি'-এর কী অর্থ?

প্রকৃতপক্ষে কোনো বস্তুকে হালাল অথবা হারাম করা আর কোনো বস্তুকে শরয়ি কোনোপ্রকার দলিল ছাড়া ফরজ ও ওয়াজিব আখ্যা দেওয়া কিংবা বিশেষ কোনো রূপকে বিশেষ কিছু আদব ও শর্তের সঙ্গে সাওয়াব ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। উভয়টিই 'আল্লাহ যে শরিয়াহর অনুমোদন দেননি'-এর বিধানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিদআত উদ্ভাবন দীনের পরিপূর্ণতা অস্বীকার করার নামান্তর

বিদআত প্রসঙ্গে দ্বিতীয় যে বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়, তা হলো শরিয়াহ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। যে বিষয়গুলো নির্ধারিত হওয়ার ছিল, সেগুলো নির্ধারিত হয়ে গেছে। একজন মানুষের মুক্তির জন্য যত আমল প্রয়োজন এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য যত মাধ্যমের প্রয়োজন, তা সবই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। দীনের টাকশাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন যেসব নিত্যনতুন মুদ্রা তার দিকে সম্পর্কিত করা হবে, তা সবই জাল বলে বিবেচিত হবে।

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে (চিরদিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম।'[৪০]

আদি ইবনে হাতিম রা. বলেন, আমি আসলাম। আমি গলায় স্বর্ণের ক্রুশ পরে নবিজি ﷺ-এর সামনে এলাম। তিনি বললেন, হে আদি, তোমার গলা হতে এই প্রতীমা সরিয়ে ফেলো। আর আমি তাঁকে সুরা বারাআতের এই আয়াত পাঠ করতে শুনলাম—(অনুবাদ) : 'তারা আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদেরকে নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।' তারপর তিনি বললেন, তারা সরাসরি তাদের পূজা করত না। তবে এ সকল ধর্মীয় পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীরা কোনো জিনিসকে যখন তাদের জন্য হালাল বলত, তখন সেটাকে তারা হালাল বলে মেনে নিত। আবার তারা কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হারাম বলত, তখন নিজেদের জন্য সেটাকে হারাম বলে মেনে নিত। (সুনানুত তিরমিজি : ৩০৯৫)

৪০. সুরা মায়িদা : ৩

এ কথা তো নিয়ামত পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধপূর্ণ যে, দীন ও শরিয়াহর এক বড় অংশ অস্পষ্ট এবং অনির্ধারিত রেখে দেওয়া হবে আর শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলমানরা তা জানার ব্যাপারে উদাসীন থাকবে এবং তার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে। বিশেষ করে খাইরুল কুরুনের[৪১] সেই সব ব্যক্তি, যারা এর প্রথম সম্বোধিত পাত্র ছিলেন। এরপর কয়েক শতাব্দী পর তা উন্মোচিত এবং সুনির্ধারিত হবে।

বিদআত রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শানে রিসালাতের ওপর অপবাদ

এই শরিয়াহর মধ্যে যে ব্যক্তি নতুন কিছু সংযোজন করবে, দীন-বহির্ভূত কোনো জিনিসকে দীনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবে, কোনো এমন বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করবে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল যার ওপর গুরুত্বারোপ করেননি অথবা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নতুন কোনো মাধ্যম উদ্ঘাটন করবে, সে যেন তার কার্যকলাপ দ্বারা এই কথা বলতে চায় যে, দীনের মধ্যে এই কমতি রয়ে গিয়েছিল আর এখন তা পূর্ণ করে দেওয়া হচ্ছে। এটা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতের বার্তা প্রচারের ওপর আরোপিত বড় ধরনের অপবাদ, যেই রাসুলের ওপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আদেশ ছিল—

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

'হে রাসুল, আপনার ওপর যা কিছু নাজিল করা হয়েছে, আপনি তা পৌঁছে দিন। যদি এরূপ না করেন তাহলে আপনি আপনার রিসালাতের বার্তা প্রচার করেননি।'[৪২]

ইমাম মালিক রহ. বড় সুন্দর বলেছেন—

من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)، فما

---

৪১. অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পর প্রথম তিন প্রজন্ম—সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবে তাবেয়িদের যুগ।
৪২. সুরা মায়িদা : ৬৭

لم يكن يومئذ دينا، فلا يكون اليوم دينا

'যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো বিদআত উদ্ভাবন করে আর সেটাকে উত্তম মনে করে, সে তো এ কথার দাবি করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ রিসালাতের দায়িত্ব আদায়ে খেয়ানত করেছেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।'[৪৩]

সুতরাং সে যুগে যা দীনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, এ যুগে এসেও তা দীনের অন্তর্ভুক্ত হবে না।'[৪৪]

আল্লাহর শরিয়াহ সহজ ও সার্বজনীন

আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ শরিয়াহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তা সহজ-সরল এবং সকল যুগে প্রত্যেকের জন্য আমলযোগ্য। আল্লাহ তাআলা মহা প্রজ্ঞাবান এবং সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ অবগত। তিনি মানবজাতির মানবীয় দুর্বলতা, তাদের কল্যাণ-স্বার্থ এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত। এর পাশাপাশি তিনি মহান দয়ালু ও অসীম দয়াবান। এই সর্বব্যাপী জ্ঞান এবং অসীম দয়ার কারণে তিনি মানবজাতির জন্য নির্বাচিত রাসুলগণের মাধ্যমে সহজ-সরল শরিয়াহ অবতীর্ণ করেছেন। শরিয়াহর বিধিবিধানের ক্ষেত্রে মানুষের দুর্বলতা, জটিলতা এবং ত্রুটির দিকে পুরোপুরি লক্ষ রাখা হয়েছে। আর মানুষের সামর্থ্য, সহিষ্ণুতা, ব্যাপকতা এবং স্থান ও কালের প্রতি লক্ষ রেখে মহান প্রতিপালক তাদের জন্য এক বিশ্বজনীন ও চিরন্তন পরিপূর্ণ জীবনবিধান রচনা করে দিয়েছেন। কুরআন মাজিদে এর বর্ণনা নিম্নরূপ—

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

'আল্লাহ কারও ওপর সাধ্যাতীত কিছু চাপিয়ে দেন না।'[৪৫]

---

৪৩. সুরা মায়িদা : ৩

৪৪. আল-ই'তিসাম, শাতেবি : ১/৪৯

৪৫. সুরা বাকারাহ : ২৮৬

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান। তিনি তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না।'[৪৬]

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

'দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি।'[৪৭]

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

'তোমাদের কাছে এমন এক রাসুল এসেছে, যে তোমাদের নিজেদেরই লোক। তোমাদের যেকোনো কষ্ট তার জন্য অতি পীড়াদায়ক। সে সতত তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত সদয় এবং পরম দয়ালু।'[৪৮]

রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজ শরিয়াহর ব্যাপারে বলেছেন—

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

'আমাকে নেহাত সাদাসিধা সরল দীনসহকারে প্রেরণ করা হয়েছে।'[৪৯]

إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ

'নিশ্চয়ই এই দীন সহজ।'[৫০]

রাসুলুল্লাহ ﷺ উম্মাহর কষ্টের কথা এত বেশি খেয়াল করেছেন যে, তিনি বলছেন—

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

---

৪৬. সুরা বাকারাহ : ১৮৫
৪৭. সুরা হজ : ৭৮
৪৮. সুরা তাওবা : ১২৮
৪৯. মুসনাদু আহমাদ : ২২২৯১
৫০. সুনানুন নাসায়ি : ৫০৩৪

'আমি যদি আমার উম্মাহর ব্যাপারে কষ্টের আশঙ্কা না করতাম তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক নামাজের সময় মিসওয়াক করার আদেশ করতাম।'[৫১]

বিদআতের সংকীর্ণতা এবং জটিলতা

দীনের এই সহজতা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এই বিষয়ের দায়িত্বপরায়ণতা সে সময় পর্যন্ত কার্যকর থাকবে, যতক্ষণ আল্লাহ তাআলা শরিয়াহ প্রণেতা থাকবেন এবং শরিয়াহ তাঁর প্রণীত থাকবে। কিন্তু যখন মানুষ নিজেই শরিয়াহ প্রণেতা হয়ে যায় এবং সে আল্লাহ তাআলার প্রণয়ন করা শরিয়াহর মধ্যে হস্তক্ষেপ ও সংযোজনের ধারার সূত্রপাত করে তখন আর দীনের সহজতা বাকি থাকে না। মানুষের জ্ঞান সর্বব্যাপী নয়; আর না সে বিভিন্ন ধরনের মানুষের প্রয়োজনীয়তা, কল্যাণ-চেষ্টা এবং কাল ও স্থানের বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ রাখতে পারে। একইভাবে মানবজাতির প্রতি তার সেই পরিমাণ দয়াও থাকতে পারে না, যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের থাকে। ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, বিশুদ্ধ দীন থাকা অবস্থায় যে বিষয়গুলো প্রত্যেকের জন্য আমলের উপযোগী এবং বিলকুল সহজ হয়ে থাকে, তা এই বিদআতের সংমিশ্রণ এবং সময়ে সময়ে সংযোজনের পর এতটা দুরূহ, জটিল এবং দীর্ঘ হয়ে যায়, যার ওপর পুরোপুরি আমল করা সময়ে সময়ে অসম্ভব হয়ে উঠতে থাকে। মানুষের মধ্যে দীন থেকে পালিয়ে বেড়ানো এবং অসৎ কৌশল অবলম্বনের অভ্যাস গড়ে ওঠে। এমনকি অনেক মানুষ এই ধর্মের হার নিজেদের গলা থেকেই খুলে ফেলতে শুরু করে। বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস যদি গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করা হয় তাহলে জানা যাবে, ধর্মত্যাগের অধিকাংশ ধারা এবং নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার সূচনা সাধারণত এসব অশেষ বিদআতের পরই সূচিত হয়েছে, যেগুলো মেনে চলা একজন মধ্যম পর্যায়ের মানুষের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল আর সেগুলো মানতে গেলে মানুষের জন্য আর অন্য কোনো কাজ করাই সম্ভবপর হচ্ছিল না। বিগত শতাব্দীতে গির্জার বিরুদ্ধে জ্ঞান ও বিবেকের বিদ্রোহও এই ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধেই ছিল, যার সঙ্গে প্রকৃত খ্রিষ্টধর্মের এক-দশমাংশ সম্পর্কও ছিল না।

৫১. সহিহ বুখারি : ৮৮৭

শরিয়াহর এককতা ও অভিন্নতা

এই সূক্ষ্ম ব্যাপারটিও লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তাআলার প্রণীত দীন ও শরিয়াহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তা সমগ্র পৃথিবীর জন্য অভিন্ন। এই অভিন্নতা কালের বিচারেও, স্থানের বিচারেও। আল্লাহ যেহেতু পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সব দিকেরই রব, তিনি যেহেতু কাল ও স্থানের বন্ধন থেকে মুক্ত, এ জন্য তার শরিয়াহতে পরিপূর্ণ অভিন্নতা পাওয়া যায়। তার সর্বশেষ শরিয়াহ—যা তাঁর সর্বশেষ নবির মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে—দিবাকরের মতো সবার জন্য এক, পৃথিবী ও আকাশের মতো সবার জন্য সমান। তার যে রূপ প্রথম শতাব্দীতে ছিল, সেই একই রূপ পঞ্চদশ শতাব্দীতেও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তা যেমন ও যতটুকু প্রাচ্যবাসীর জন্য, তেমন ও ততটুকু প্রতীচ্যবাসীর জন্যও। যে মূলনীতি ও বিধিবিধান, ইবাদতের যে আকৃতি এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের যে প্রকৃতি আরববাসীর জন্য ছিল, ঠিক তা-ই হিন্দুস্তানবাসীর জন্যও রয়েছে। এ জন্য পৃথিবীর কোনো অঞ্চলের অধিবাসী যদি পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তেও চলে যায় তবুও ইসলামের ফরজ বিধিবিধান এবং মসজিদের মধ্যে ইবাদত আদায় করতে তার কোনো কষ্ট বরণ করতে হবে না; আর না তার জন্য কোনো আঞ্চলিক দিকনির্দেশনা এবং পথনির্দেশের প্রয়োজন আছে। দীনি বিচারে তার কোনো নতুনত্ব ও অভিনবত্ব অনুভব হবে না। এমনকি তাকে শুধু মুক্তাদি হয়ে থাকতে হবে—বিষয়টি এমনও নয়; বরং জ্ঞানী হলে সে নিজেও ইমাম হতে পারবে এবং সব জায়গায় ফাতওয়া দিতে পারবে।

বিদআতের বিরোধ ও ভিন্নতা

কিন্তু বিদআতের উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য নেই। বিদআতের মধ্যে এককতা ও অভিন্নতা নেই। তার মধ্যে স্থান ও কালের প্রভাব বিদ্যমান। বিদআত প্রত্যেক অঞ্চলের আঞ্চলিক ছাঁচে এবং প্রত্যেক শহর-নগরের স্থানীয় টাকশাল থেকে মুদ্রিত হয়ে আসে। তা বিশেষ ঐতিহাসিক এবং স্থানীয় কার্যকারণ ও পরিবেশ-পরিস্থিতিতে উদ্ভূত হয়ে থাকে। পুরো ইসলামি বিশ্বে সেটাকে প্রচলন দেওয়া যায় না। আর না পুরো বিশ্বের সব মুসলমানের সে ব্যাপারে অবগতি লাভ করা আবশ্যক মনে করা হয়। তদুপরি অবগতি লাভ হলেও এটা আবশ্যক হয় না

যে, সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে তা মানতে হবে। এ জন্য হিন্দুস্তানের বিদআত মিশরের বিদআতের চাইতে ভিন্ন। ইরান এবং শাম অঞ্চলের বিদআতের মধ্যেও মিল নেই। দেশের প্রেক্ষাপট বাদ দিলেও একেক শহরের বিদআতের সঙ্গে অন্য শহরের বিদআতের ভিন্নতা থাকে। এক শহরের মুসলমানদের অন্য শহরের বিদআতের জ্ঞান পর্যন্ত থাকে না। এ বিষয়টা আরও আগে বেড়ে এলাকা, এমনকি ঘর পর্যন্তও পৌঁছে যায়। এক ঘরের পালিত দীন অন্য ঘরের পালিত দীনের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়।

বিদআতের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কঠোর সতর্কবাণী

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে অন্যান্য শরিয়াহ ও ধর্মের শিক্ষণীয় পরিণতি ছিল। সে সময় ইহুদিধর্ম এবং খ্রিষ্টধর্ম বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার শিকাররূপে বিদ্যমান ছিল। এ জন্য তিনি ইসলামি শরিয়াহকে তার বাস্তবিক রূপ এবং প্রকৃত মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য পুরোপুরি চেষ্টা করেছেন। এ জন্য তিনি সব ধরনের সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি তার উত্তরসূরিদের বিদআত থেকে বাঁচা এবং সুন্নাহ সংরক্ষণের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ

'যে আমাদের এই দীনে এমন কোনো কিছু উদ্ভাবন করবে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।'[৫২]

إِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

'তোমরা সকল নবোদ্ভাবিত বিষয় (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, প্রত্যেক বিদআত গোমরাহি। আর প্রত্যেক গোমরাহি জাহান্নামে যাবে।'[৫৩]

---

৫২. সহিহ বুখারি : ২৬৯৭; সহিহ মুসলিম : ১৭১৮
৫৩. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২

এ ছাড়াও তিনি এই প্রজ্ঞাপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন—

مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ

'কোনো সম্প্রদায় যখন কোনো বিদআত উদ্ভাবন করে তখন তার সমপরিমাণ সুন্নাহ তাদের থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়।'[৫৪]

বিদআতের ব্যাপারে সাহাবিগণের অবস্থান

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সরাসরি উত্তরসূরি সাহাবিগণ এই ওসিয়তের ওপর পুরোপুরি আমল করেছেন। তারা বিদআতের ব্যাপারে কোনো ধরনের শৈথিল্য বা দুর্বলতা প্রদর্শন করেননি। যদি তাদের বিদআত প্রত্যাখ্যানের ঘটনাগুলোর দিকে লক্ষ করা হয় তবে এমন যেকোনো ব্যক্তি—বিদআতের প্রকৃত অনিষ্টতা এবং শরিয়াহ সংরক্ষণের হিকমাহ ও রহস্যের ব্যাপারে যার অবগতি নেই—এসব ঘটনাকে অতিরঞ্জন, কট্টরতা এবং নিতান্ত বাড়াবাড়ি হিসেবে মূল্যায়ন করবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি ধর্মসমূহের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত থাকে তাহলে সে তাদের হিকমাহ এবং সুগভীর জ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়ে এই মন্তব্য করতে বাধ্য হবে যে, দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যেই যদি ধর্মের মূল রূপ ক্ষুণ্ণ না থাকে তাহলে কোনো ধর্মই আর টিকে থাকতে পারে না।

বিদআতের ব্যাপারে ইমামগণের অবস্থান

সাহাবিগণের পরে ইমাম ও ফকিহগণ সর্বোচ্চ পর্যায়ের দীনের উপলব্ধি এবং এমন আপসহীন মানসিকতা ও সুদৃঢ় অবিচলতার পরিচয় দিয়েছেন, যা নবিগণের উত্তরসূরিদের যথার্থ ভূষণ ও মর্যাদা। তারা সর্বদা নিজেদের সময়ের বিদআতের কঠোর বিরোধিতা করেছেন। বিদআতিদেরকে জ্ঞানগতভাবে ও কর্মগতভাবে বয়কট করেছেন। ইসলামি সমাজে এসব বিদআত যেন গ্রহণযোগ্যতা না পায় এবং বিদআতের ধ্বজাধারীরা যেন সম্মানিত ও মর্যাদাবান না হতে পারে—এ জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সর্বযুগের আলিমদের দৃষ্টিতে এসকল বিদআতিকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

৫৪. মুসনাদু আহমাদ : ১৬৯৭০

বিশেষ করে হানাফি ফকিহরা যে গভীর পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও অন্তঃসার উপলব্ধি দিয়ে নিজেদের সময়ের বাহ্যদৃষ্টিতে মামুলি কিছু বিদআতি কার্যকলাপ এবং আচারপ্রথার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, শরিয়াহর যথাযথ সংরক্ষণ এবং সুন্নাহ ও বিদআতের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণের জন্য যে হিকমাহপূর্ণ ব্যবস্থাদি এবং ফিকহি সতর্কতা গ্রহণ করেছেন, তা দীনের মৌলিক বিষয়াদির ব্যাপারে তাদের সুগভীর জানাশোনা এবং ব্যাপক ব্যুৎপত্তিরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিদআতের মধ্যে সাধারণ মানুষ এবং দীন পালনে আগ্রহী অস্পষ্ট আকিদাধারী মুসলমানদের জন্য যে কী পরিমাণ চুম্বুকার্ষণ রয়েছে এবং বিদআত আগ্নেয়গিরির তপ্ত লাভার মতো কী দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে ও ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে—এ ব্যাপারে যাদের জানাশোনা রয়েছে, তারা এই আলিমগণের হিম্মত, অসীম সাহসিকতা এবং সফলতার ব্যাপারে নির্দ্বিধ সাক্ষ্য দেবে; যাদের চেষ্টা, পরিশ্রম এবং সুস্পষ্ট সত্য প্রকাশের মাধ্যমে কোনো কোনো বিদআত পুরোপুরি কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে, তার দুয়ার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে। এখন শুধু ফিকহের কিছু গ্রন্থ বা ইতিহাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কোনো কোনো বইপত্রেই কেবল তার উল্লেখ রয়ে গেছে। কিছু বিদআত যা অবশিষ্ট রয়ে গেছে, সেগুলোও বিদআত হওয়ার বিষয়টি অস্পষ্ট থাকেনি। উপরন্তু একদল আলিম সর্বদা সেগুলোর বিরোধিতা করে গেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন।

বিদআতের ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের অবস্থান

বিদআতের বিরুদ্ধাচারণকারী এবং সুন্নাহর ঝাণ্ডা বহনকারী এসকল সাহসী আলিমগণের ভাগ্যে তাদের যুগের সাধারণ জনতা এবং আলিমরূপী অথর্বদের থেকে 'জড়গ্রস্ত', 'বর্ণনাপূজারী' ইত্যাদি উপাধি জুটেছে; যেভাবে প্রত্যেক যুগেই যুগচাহিদার বিপরীত এবং ব্যাপক প্রচলনের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদানকারী এবং অবস্থান গ্রহণকারীদের ভাগ্যে জুটে থাকে।

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ

'আপনাকে তো কেবল সেসব কথাই বলা হচ্ছে, যা আপনার পূর্বে বিগত হওয়া রাসুলদেরও বলা হয়েছিল।'[৫৫]

---

৫৫. সুরা ফুসসিলাত : ৪৩
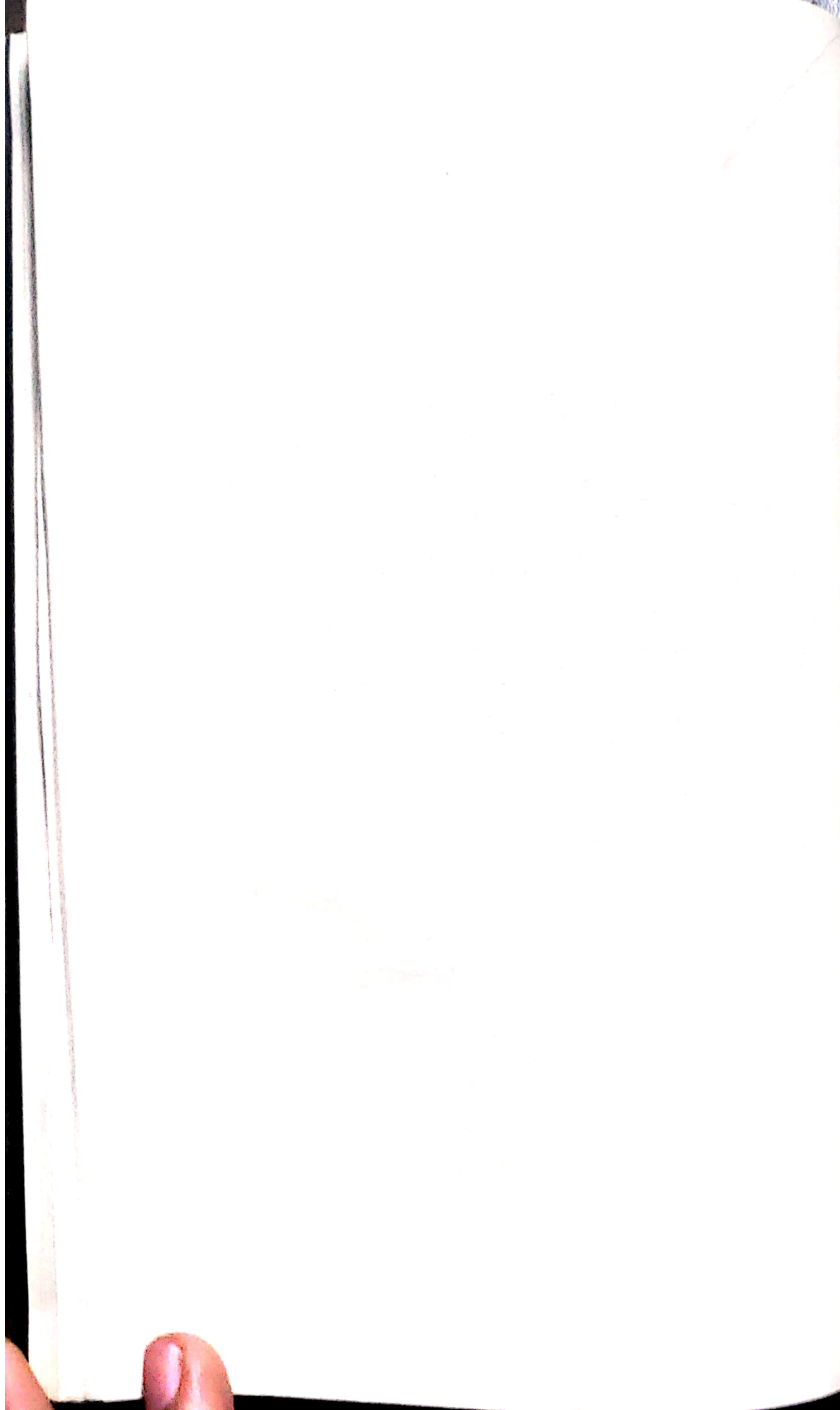
উদাসীনতা

উদাসীনতার তত্ত্বকথা

আল্লাহ তাআলার দীন থেকে বিচ্যুত হওয়ার এক সাধারণ কারণ হলো উদাসীনতা। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্কহীনতা, তার বিধিবিধান এবং নীতি-নৈতিকতাকে উপেক্ষা করা সর্বদা বিদ্রোহ এবং কুফরই হয় না; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হয় ইহজাগতিকতা ও জড়বাদ। সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জন, সম্পদের মোহ এবং জীবন-জীবিকার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জন মানুষকে পরকালের ব্যাপারে পুরোপুরি উদাসীন বানিয়ে দেয়।

জড়বাদের প্রাধান্য এবং তার ফলাফল

মানুষের ওপর জড়বাদী মানসিকতা এতটাই প্রবল হয়ে যায় যে, একপর্যায়ে—

- পরকালের মুক্তির চিন্তা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আগ্রহ এবং তাঁর শাস্তির ভয় অন্তর থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে যায়।
- খানাপিনা এবং ভোগবিলাস ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো চিন্তা বাকি থাকে না।

আল্লাহর ব্যাপারে উদাসীন মানুষজনের সাহচর্য অন্তরকে এমনভাবে মেরে ফেলে যে, একপর্যায়ে—

- দীনি এবং চারিত্রিক বোধ-অনুভূতি হারিয়ে যায়।
- ভালো এবং মন্দ, হালাল এবং হারামের পার্থক্য দূর হয়ে যায়।
- এসব উদাসীনদের চরিত্র ও কাজকর্ম, জীবনচরিত ও আদর্শ, সামাজিকতা ও শিষ্টাচার, বাহ্যিক বেশভূষা ও পোশাক-আশাক কাফির সম্প্রদায়, বরং খোদাদ্রোহীদের থেকে সবিশেষ ভিন্নতর থাকে না।
- নেশার সাগরে দিনমান হাবুডুবু খায়।

- ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়াদিতে লিপ্ত থাকে।
- অপরাধ, পাপাচার ও অশ্লীলতার নিত্যনতুন আবিষ্কার চালাতে থাকে। এ ক্ষেত্রে মেধা, যোগ্যতা, প্রতিভা ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের এমন অভূতপূর্ব বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে থাকে যে, পূর্বের সব জাতি-গোষ্ঠীর কীর্তি এর সামনে এসে ম্লান হয়ে যায়।
- দীন ও শরিয়াহর কোনো সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে না।
- এমন ব্যক্তি শুধু স্রষ্টাকেই ভুলে থাকে না; বরং সে নিজেকেও ভুলে যায়। ফলে না কখনো স্রষ্টাকে স্মরণ করে আর না নিজ সত্তার ব্যাপারে তার কোন হুঁশ থাকে।

উদাসীনতার ব্যাপারে ইসলামের নিষেধাজ্ঞা

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

‘তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল, ফলে আল্লাহ তাকে আত্মভোলা করে দেন। বস্তুত তারাই অবাধ্য।’[৫৬]

এরাই সেই সকল লোক, যাদের অবস্থা আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন—

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ۞ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

‘যারা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রত্যাশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলি সম্পর্কে উদাসীন, নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম।’[৫৭]

---

৫৬. সুরা হাশর : ১৯
৫৭. সুরা ইউনুস : ৭

দীনের পথে উদাসীনদের প্রতিবন্ধকতা

কাজের বিচারে এবং ফলাফলের বিচারে এ ধরনের উদাসীন ব্যক্তি ইসলামের নিদর্শন ও আখিরাত বিস্মৃত, পরকাল অস্বীকারকারী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিদ্রোহ পোষণকারীদের থেকে আলাদা থাকে না। নবিগণের দাওয়াহর পথে তাদের অস্তিত্ব এতটাই অনর্থক, বরং অনেক সময় এমনই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় যে, যেমনিভাবে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও অস্বীকারকারীদের অস্তিত্ব প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। কোনো কোনো সময় তো এসকল স্বঘোষিত মুসলিম ইসলামের বিপক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার কারণ ও ইসলাম প্রচারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

বিলাসীদের জাহিলি শাসন

এরচেও বড় দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, এসকল উদাসীন বা মুনাফিক নিজেদের সংখ্যাধিক্য, পার্থিব মান-মর্যাদা, চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে বা স্রেফ উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে মুসলমানদের ক্ষমতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বসে। মুসলমানদের শাসনব্যবস্থা তাদের হাতের মুঠোয় চলে আসে। অথবা তারা মুসলমানদের জীবনে এমন প্রভাব ও প্রতিপত্তি সৃষ্টি করে বসে যে, তাদের চরিত্র ও কার্যকলাপ সাধারণ মানুষদের জন্য এক আদর্শের রূপ পরিগ্রহ করে এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদা মানুষের মন ও মস্তিষ্কে গিয়ে আসন গেড়ে নেয়। তখন সেই অপরাধী নেতাদের কারণে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে অনৈসলামিক জীবন যাপনের এমন এক ধারা সূচিত হয়ে যায় যে, মুসলমানদের প্রায়োগিক জীবনে জাহিলিয়াতের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কখনো এই জীবনধারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়ীও হয়ে যায়। তখন এটাই ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি নামে প্রচলন লাভ করে ফেলে। যার বিরুদ্ধাচারণ করা অনৈসকলামিক সভ্যতা-সংস্কৃতির মোকাবেলা করার চাইতে দুরূহ হয়ে যায়।

নবিগণের উত্তরসূরিদের কাজ

এসকল অবস্থায় নবিগণের উত্তরসূরিদের বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দিতে হয়। সম্ভবত মানুষের কোনো দল এত বেশি ব্যস্ত এবং কার্য ও দায়িত্ব পালনে এত বেশি সচেষ্ট নয়, যতটা নবিগণের স্থলাভিষিক্ত, আলিম-উলামা এবং দীনের সংস্কারকদের জামাআত ব্যস্ত ও সচেষ্ট থাকে। দৈহিক রোগব্যাধির চিকিৎসকদের জন্য কখনোসখনো আরাম-আয়েশ এবং অবসর যাপনের সুযোগ হয়ে ওঠে; কিন্তু এই আধ্যাত্মিক চিকিৎসকদের জন্য কোনো ঋতুই এমন নয়, যেখানে তারা খানিকটা স্থির থাকতে পারে এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে।

অনেক দল এমন আছে, যখন তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন তাদের চেষ্টা-পরিশ্রম পরিসমাপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়। কিন্তু হকপন্থী আলিমগণ এবং ইনসাফের সাক্ষ্যদানকারীরূপে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত জামাআতের কাজ অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের শাসনে এসেই সমাপ্ত না হয়ে উল্টো বরং সামনে অগ্রসর হতে থাকে। কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলো মুসলমানদের শাসনব্যবস্থা, শক্তি, প্রতিপত্তি এবং সুযোগ প্রতিষ্ঠিত থাকাকালেই অস্তিত্ব লাভ করে আর আলিমগণের দায়িত্ব হয় সেগুলোর যথাযথ তত্ত্বাবধান করা। সে ক্ষেত্রে তারা নিজেদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব, তত্ত্বাবধান, চারিত্রিক এবং দীনি পথনির্দেশনার দায়িত্ব থেকে সরে যান না। সে সময়ও তাদের জিহাদ এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।

- কোথাও মুসলমানদের বিলাসী জীবন যাপনের ব্যাপারে বাধারোপ করেন।
- কোথাও ভোগ ও উদাসীনতার উপকরণের ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকে।
- কোথাও মদপানের আসরে বাধা সৃষ্টি করেন।
- কোথাও জুয়া ও গানবাজনার যন্ত্রপাতি ভেঙে ফেলেন।
- কোথাও পুরুষদের জন্য রেশমি কাপড় এবং স্বর্ণ-রূপার পাত্র ব্যবহার করার ব্যাপারে বাধারোপ করেন।

- কোথাও নারীদের বেপর্দা চলাফেরা এবং নারী-পুরুষের ফ্রি মিক্সিংয়ের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন।

- কোথাও চরিত্রহীন ও মন্দ লোকদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আওয়াজ উচ্চকিত করেন।

- কোথাও নিজেদের সময়ের জঘন্য চরিত্র এবং শরিয়াহবিরোধী কথা ও কাজের বিরুদ্ধে আলোচনা করেন।

- কোথাও অমুসলিমদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করার ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধাচারণ জারি থাকে।

- কখনো মসজিদের আঙিনা এবং মাদরাসার প্রাঙ্গণে হাদিসের দরস দেন। 'কালাল্লাহ' ও 'কালার রাসুল'-এর সুমধুর আওয়াজে আকাশ-বাতাস ভারী করে তোলেন।

- কখনো খানকাহে বসে, কখনো নিজের ঘর বা মসজিদে বসে অন্তরের মরিচা দূর করেন। আল্লাহর মহব্বত এবং ভালোবাসার আগ্রহ জাগিয়ে তোলেন। অন্তরের ব্যাধি—হিংসা, অহংকার, দুনিয়ার লোভ এবং অন্যান্য আত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা করেন।

- কখনো মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে মানুষকে জিহাদি চেতনায় উজ্জীবিত করেন। ইসলামী সীমান্তের হেফাজত কিংবা ইসলামি বিজয়ের ধারা এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করেন।[৫৮]

---

৫৮. আগের সবগুলো বৈশিষ্ট্য আজও অল্পবিস্তর বিদ্যমান পাওয়া যায়। কেবল এই বৈশিষ্ট্যটিই যেন 'আনকা' পাখি। কিছু বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া সমাজে এর চর্চা দেখাই যায় না। সবাই আল্লাহর দীনের যথাযথ হেফাজতের চিন্তা ভুলে গিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত। পেট ও পিঠ নিয়ে উদ্বিগ্ন।

বিলাসীদের শাসনামলে আলিমগণের অবদান

পুরো ইসলামি ইতিহাসজুড়েই এমন সব প্রাণবান ও আল্লাহওয়ালা আলিমগণের উপস্থিতি আপনার চোখে পড়বে, যারা নিজেদের সময়কার শাসকদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন না কিংবা পরস্পরের মধ্যে তুচ্ছ বিবাদেও লিপ্ত ছিলেন না। বরং তারা উপরিউক্ত ক্ষেত্রগুলোর মধ্যেই নিজেদের ব্যস্ততাকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। মুসলমানদের কোনো শাসনকাল এ-জাতীয় হকপন্থী আলিমগণের চেষ্টা-প্রচেষ্টা থেকে মুক্ত ছিল না।

হজরত হাসান বসরি রহ.

বনু উমাইয়ার শাসনামল মুসলমানদের জন্য প্রতিপত্তির যুগ ছিল। বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের সকল কাজ থেকেই অবসর মিলে গিয়েছিল; কিন্তু তখনো আলিমদের কোনো অবসর ছিল না। হজরত হাসান বসরি রহ.-এর আলোচনার মজলিস ছিল স্মরণীয়। যেখানে তিনি নিজেদের সময়কার অনৈতিক ও গর্হিত কার্যকলাপ এবং বিদআতের বিরুদ্ধে দৃপ্তকণ্ঠে আলোচনা করতেন। তখনকার সামাজিক জীবনাচার, সার্বিক ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা এবং সরকারপন্থীদের অনৈসকলামিক কার্যকলাপের সমালোচনা করতেন। নিফাকের নিদর্শন এবং মুনাফিকদের স্বভাববৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতেন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সেগুলো মিলিয়ে দেখাতেন। আল্লাহর ভয় এবং আখিরাত প্রসঙ্গে আলোচনা করতেন; যা শুনে শ্রোতাদের অন্তর বিগলিত হতো এবং চোখ থেকে অশ্রু ঝরত। এমনকি কান্না এতটাই প্রবল হয়ে যেত যে, কাঁদতে কাঁদতে মানুষের হেঁচকি বন্ধ হয়ে যেত। সুরা ফুরকানের সর্বশেষ রুকুর ইবাদুর রহমানের গুণাবলি-সংক্রান্ত আয়াতগুলোর তাফসির করতেন। সাহাবিগণের চাক্ষুষ ঘটনা এবং অবস্থাদি এমনভাবে বর্ণনা করতেন যে, সেই সোনালি যুগের চিত্র শ্রোতাদের চোখে স্পষ্টভাবে ভেসে উঠত। সবাই যেন সাহাবিগণকে চলতে-ফিরতে দেখতে পেত। মানুষেরা মজলিস থেকে তাওবা করে উঠত। শত শত মানুষের চারিত্রিক অবস্থা সংশোধিত হয়ে যেত।

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ.

তখন চলছিল আব্বাসি শাসকদের যুগ। ইমাম আহমুদ ইবনু হাম্বল রহ. গদ্দিনিশীন শাসকের ঝোঁক-চাহিদা এবং মতামতের বিরুদ্ধে গিয়ে মুতাজিলাদের মাজহাবের স্পষ্ট খণ্ডণ করতে লাগলেন। বিদআতকে খণ্ডন করে সুন্নাহর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিতে লাগলেন। ইলমুল কালাম এবং দর্শনশাস্ত্রের বাড়তে থাকা ঝোঁক-প্রবণতার মোকাবেলা করে বিশুদ্ধ সুন্নাহ এবং সালাফগণের আকিদা প্রচারে রত হলেন। আর এসব কিছু এমন সাহসিকতা ও আত্মপ্রশান্তির সঙ্গে করে যাচ্ছিলেন, যেন সেটা মামুন বা মুতাসিমের শাসনামল নয়; বরং হজরত উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহ.-এর খিলাফাহর আমল।

মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযি রহ.

বাগদাদ তখন উন্নতির শিখরে অধিষ্ঠিত। বাগদাদের সভ্যতা, ধনসম্পদ, ইহজাগতিকতা ও স্বাধীনতা সর্বোচ্চ স্তরে স্থিত। চারিদিকে ভোগ ও উদাসীনতার স্ফীত সমুদ্র পরিদৃষ্ট। কারাখ ও রাসাফের ময়দানে এবং মসজিদের সামনে মেলা বসেছে। বাজারগুলোও ভীষণ জমজমাট। কিন্তু হাজারো মানুষ এসব চিত্তাকর্ষক দৃশ্য এবং আনন্দ-উপভোগের উপকরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখেছে। তারা এসব প্রান্তর ছেড়ে অন্যদিকে সরে গিয়েছে। আজ জুমআর দিন। মসজিদে মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযি রহ.-এর নিয়মিত আলোচনা। সেখানে আলোচনা চলছে। হাজারো মানুষ ভগ্নহৃদয় নিয়ে তাওবা করছে। অনেক অমুসলিম কালিমা পড়ে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে। মানুষজন শরিয়াহ-পরিপন্থী কার্যকলাপ থেকে অনুতপ্ত অন্তরে তাওবা করছে।

হজরত শাইখ আবদুল কাদির জিলানি রহ.

অস্থিরতা ও ফিতনায় ঘেরা বাগদাদের এক প্রান্তে বসে নেহাত আত্মপ্রশান্তি ও স্থিরতার সঙ্গে শাইখ আবদুল কাদির জিলানি রহ. ইলমের দরস, আলোচনা এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চার ধারা অব্যাহত রাখছেন। আরব-অনারব নির্বিশেষে সবাই তাঁর থেকে উপকৃত হচ্ছে। বড় বড় আমির এবং যুবরাজ সহায়-সম্পদ ও

ভোগ-বিলাসকে বিদায় দিয়ে দুনিয়াবিরাগী এবং দারিদ্র্যের জীবন গ্রহণ করে নিচ্ছে। বড় বড় ক্ষমতাপূজারী এবং প্রতিপত্তির নেশায় আসক্ত ব্যক্তি পূর্বের জীবন ত্যাগ করে তাওবা করে পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। আব্বাসি খিলাফাহর কেন্দ্রই হলো বাগদাদ। বাগদাদের খলিফাহর শাসনক্ষমতার মোকাবেলায় এই দরবেশের আধ্যাত্মিক ও দীনি শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত; যার ব্যাপ্তি পুরো আরব-অনারবজুড়ে বিস্তৃত।

আলিমগণের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর আচরণ

পরবর্তীকালের প্রত্যেক শাসনামলে, ইসলামি শাসনব্যবস্থার অধীন প্রতিটি কোণ ও প্রান্তে, আমির ও সুলতানদের বিপরীতে, অপরাপর সকল চিত্তাকর্ষক দাওয়াহ এবং আন্দোলনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হকপন্থী আলিমগণ এসকল প্রচেষ্টা এবং তাদের মারকাজ, মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ এবং বয়ানের মজলিসকেন্দ্রিক সাধনা-মুজাহাদা নিয়মতান্ত্রিকভাবে ও অনিয়মতান্ত্রিকভাবে সর্বদাই জারি রেখেছেন।

হকপন্থী আলিমগণের এই দুর্ভাগ্যবান বলি বা সৌভাগ্যবান জামাআতের নসিবে মুসলমান বাদশাহ এবং তাদের সরকারের অন্যান্য সহযোগীদের থেকে বেত্রাঘাত, জেলের অন্ধকার কুঠুরি ও বিষপানের পুরস্কার জুটেছে; যখন শাসকগোষ্ঠীর তল্পিবাহক আলিমদের ভাগ্যে অর্থকড়ি ও উপঢৌকনের থলে এবং বড় বড় পদের দায়িত্বের পরোয়ানা লাভ হয়েছে। এই জামাআতের কত সদস্য এক মুসলমান বাদশাহ হাজ্জাজের হাতে শাহাদাতের সুধা পান করেছে। এই জামাআতের এক সুমহান সদস্য ইমাম আবু হানিফা রহ.-কে আমিরুল মুমিনিন মনসুর আব্বাসির হাতে বিষপানের মাধ্যমে জীবনোৎসর্গ করতে হয়েছে। এই একই জামাআতের আরেকজন মহান সদস্য ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ.-কে সবচে আলোকিত চেতনা লালনকারী হিসেবে পরিচিত মুসলমান বাদশাহ মামুনের শাসনামলে জিঞ্জির পরিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং তার উত্তরসূরি মুতাসিমের হাতে তাকে বেত্রাঘাত খেতে হয়েছে।

শেষের দিকে এসেও কত ন্যায়পরায়ণ ও ইনসাফকারী হিসেবে খ্যাত বাদশাহর হাতে কত কত মহান বরেণ্য আলিমকে নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাদশাহ জাহাঙ্গিরের ন্যায়পরায়ণতার শিকল তো প্রসিদ্ধ। কিন্তু সে মুজাদ্দিদে আলফে সানি শাইখ আহমদ সেরহিন্দি রহ.-এর পায়েও শিকল পরাতে দ্বিধা করেনি। সত্য প্রকাশের অপরাধে এই মহান বুজুর্গকে গোয়ালিয়রের কেল্লায় বন্দি হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছে।

দীনের ধারক এবং শরিয়াহর রক্ষকদের

অপরিহার্য দায়িত্ব

দীনের সংরক্ষণ

শিরক ও কুফর এবং বিদআত ও উদাসীনতার মোকাবেলায় ইসলামকে যথাযথভাবে হেফাজতের প্রচেষ্টা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল খেদমত ও কীর্তি দীনের ধারক এবং শরিয়াহর রক্ষকগণের অপরিহার্য দায়িত্বের বিবেচনায় যদিও আমরা প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ বলতে পারি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো ইসলামেরই স্বতন্ত্র দাওয়াহ ও তাবলিগ এবং দীনেরই অব্যাহত চেষ্টা-প্রচেষ্টা—যা কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে।

لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ

'আমার উম্মাহর একটি দল সর্বদা আল্লাহর আদেশ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের অসহযোগিতা করবে কিংবা তাদের বিরুদ্ধাচারণ করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের কাছে আল্লাহর আদেশ আসে এবং তারা সেই আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।'[৫৯]

الْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ

'আল্লাহ যখন আমাকে প্রেরণ করেছেন তখন থেকে আমার উম্মাহর শেষভাগ দাজ্জালের সঙ্গে লড়াই করা অবধি জিহাদ অব্যাহত থাকবে।'[৬০]

দীন প্রচার

এ ছাড়াও দীনের আরও দুটো খেদমত রয়েছে, যা প্রত্যেক যুগের আলিমগণের দায়িত্ব। আল্লাহওয়ালা আলিমগণ তা সর্বদাই আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। ইসলামি বিজয়ের সূত্র ধরে কিছু পরিমাণে এবং দীন প্রচারক, বুজুর্গ, সুফি ও আরও একদল মুসলমানের চারিত্র-মাধুর্য এবং ভালোবাসার প্রভাবে বিপুল পরিমাণে বিজিত অঞ্চলগুলোতে মানুষের ইসলাম গ্রহণ করার পথ সুগম হয়েছে এবং

---

৫৯. সহিহ বুখারি : ৩৬৪১
৬০. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর : ২৩৬৭

লাখো লাখো মানুষ ইসলামবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও তারবিয়াতের কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং তাদের ওপর ইসলামি শিক্ষার কোনো প্রভাবও পড়েনি। অথবা তাদের ওপর যদি কিছু প্রভাব পড়েও থাকে, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সেই প্রভাব অবশিষ্ট থাকেনি। ফলে একটা পর্যায়ে তাদের এ ছাড়া আর কিছুই স্মরণ ছিল না যে, আমাদের বাপ-দাদা মুসলমান ছিল এবং তারা অমুক সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইসলামি নাম এবং কালিমা তায়্যিবার শব্দগুলো ছাড়া তাদের কাছে ইসলামের কোনো চিহ্নও অবশিষ্ট ছিল না। এরপর আরও কিছু দিনের লাগামহীনতার কারণে ইসলামি নামও আর কি থাকে না। এমনকি হাজারজনের মধ্যে অল্প সংখ্যক মানুষ বাদে বাকিদের কালিমা তায়্যিবাটাও স্মরণ থাকে না। তবে নিজেদের মুসলিম পরিচয় বাকি থাকে। অবশেষে একটা পর্যায়ে এসে তা-ও হারিয়ে যায় এবং শেষাবধি পুরোদস্তুর ধর্মত্যাগ অস্তিত্ব লাভ করে।

হিন্দুস্তানের মতো একটা দেশ—যেখানে নির্দিষ্ট ঘরানার বাইরে ইসলামের ভিত সর্বদাই দুর্বল—এখানে এর প্রচুর পরিমাণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রায় প্রতিটি বড় শহর থেকে কিছুটা দূরত্বে এবং হিন্দুস্তানের সকল আনাচে-কানাচে এমন লাখো লাখো মুসলিম সম্প্রদায় ও জনপদের দেখা পাওয়া যায়, ইসলামের সঙ্গে যাদের দূরতম সম্পর্কও বাকি নেই। মফস্বলের মুসলিম আবাদির বড় একটা অংশও এমন, যারা নতুন করে ইসলামের তাবলিগের দিকে মুখাপেক্ষী। তাদের মধ্যে এরকম মুসলিমের সংখ্যাও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে, যারা এখনো জাহিলি যুগেই রয়ে গেছে। নবি ﷺ-এর আগমনের সংবাদটাও তারা আজ অবধি পায়নি। তারা ইসলাম সম্পর্কে এতটাই বেখবর, যতটা বেখবর মফস্বলের বিধর্মীরা। ফরজ এবং ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধান তো দূরের কথা, অনেক বড় শহরের পাশে অবস্থিত মফস্বলে এমন মুসলিমেরও দেখা পাওয়া যায়, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নাম সম্পর্কেও যাদের কোনো অবগতি নেই।

কোনো কোনো আল্লাহওয়ালা আলিম নিজেদের সময়ে এসকল এলাকা ও গ্রামের দিকে নজর দিয়েছেন এবং অনেক অনেক মুসলিম সম্প্রদায় ও জনপদকে নতুন করে মুসলমান বানিয়েছেন। এসব অঞ্চলে তাবলিগি মেহনতের সূত্রপাত করেছেন। ওয়াজ করেছেন। নাসিহাহ দিয়েছেন। সবার

সঙ্গে মিলেমিশে নিজেদের চরিত্র-মাধুর্য এবং অন্তরের সম্প্রীতি সৃষ্টির দ্বারা তাদের অন্তরগুলোকে আকৃষ্ট করেছেন। তাদেরকে মুরিদ বানিয়ে তাওহিদ ও সুন্নাহ অনুসরণের পথে উঠিয়ে এনেছেন। শিরক ও বিদআত থেকে তাওবা করিয়েছেন। জাহিলি রসম-রেওয়াজ, অমুসলিমদের বেশভূষা ও আকৃতি-প্রকৃতি এবং কুফর ও জাহিলিয়াতের প্রতীক থেকে বের করে এনেছেন। তাদের মধ্যে চরিত্র ও মানবতা জাগিয়েছেন। ফরজ বিধানের অনুসারী এবং সময়ের সদ্ব্যবহারকারী বানিয়েছেন। তাদের ভেতরে ইলমের আগ্রহ ও তৃষ্ণা সৃষ্টি করেছেন এবং ইলমের চর্চাকে ব্যাপক করেছেন। তাদের মধ্য থেকে উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে আলাদা করে ও নিজেদের সাহচর্যে রেখে তালিম ও তারবিয়াত করেছেন। এরপর তাদের দ্বারা নিজেদের সম্প্রদায় এবং অন্যান্য মানুষজনের মধ্যে দীন প্রচার করিয়েছেন ও তাদের অবস্থা সংশোধন করিয়েছেন। এই তাবলিগি কর্মকাণ্ড—যা নবিগণের কর্মপন্থার সঙ্গে সবচে বেশি বাহ্যিক সাদৃশ্যপূর্ণ—তাদের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের চাইতে কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

দীন শিক্ষা

কুরআন এবং হাদিস হলো ইসলামি শক্তির মূল উৎস; যা থেকে সর্বদা শক্তি ও আলো অর্জন করা যায় এবং যার দ্বারা প্রত্যেক যুগে মুসলমানদের দুর্বল থেকে দুর্বলতর সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা যায়। শিরক, কুফর, বিদআত ও উদাসীনতার গায়ে সবচে কার্যকর আঘাত হলো কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান এবং তার প্রচার। এ দুয়ের যথার্থ জ্ঞান ও আলো যত বেশি ছড়িয়ে দেওয়া হবে, কুফর ও অজ্ঞতার অন্ধকার তত বেশি পালিয়ে বেড়াবে। এ জন্য হাজার তাবলিগের এক তাবলিগ হলো এর প্রচার এবং প্রসার।

একতা ও অভিন্নতা

নবিগণের বড় বৈশিষ্ট্য হলো, তারা সবাই এক ও অভিন্ন কথা বলতেন এবং সর্বদা তা-ই বলতে থাকতেন। কী সেই কথা?

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।'[৬১]

তাদের উত্তরসূরিদেরও এই বৈশিষ্ট্য যে, তাদের সব ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং জীবনের বহুমুখী কর্মব্যস্ততার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও একটাই হয়। আর তা হলো, আল্লাহর দিকে মানুষকে দাওয়াহ করা। দরস-তাদরিস, বয়ান-বক্তৃতা, তাবলিগ ও নাসিহাহ, গ্রন্থ রচনা ও সংকলন, আত্মশুদ্ধির সাধনা ও তাসাওউফ, বাইয়াত ও ইরশাদ—এসব কিছুর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সৃষ্টিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা এবং আল্লাহর প্রকৃত বান্দায় পরিণত করা। তাদের কর্মব্যস্ততা অসংখ্য ও বহুমুখী হতে পারে; কিন্তু সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু ও লক্ষ্য একই হয়ে থাকে। তারা সবকিছু বলেন; কিন্তু বাস্তবে একই কথা বলেন এবং বারবার বলেন। হজরত নুহ আ.-এর মতো তারাও এত সব ব্যস্ততা এবং বিভিন্নমুখী তাবলিগি পন্থার দিকে ইশারা করে বলেন—

رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا

'হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয়ই আমি রাত-দিন আমার সম্প্রদায়কে দাওয়াহ করেছি।'[৬২]

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۞ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا

'তারপর আমি তাদেরকে জোরকণ্ঠে দাওয়াত দিয়েছি। তারপর আমি প্রকাশ্যেও তাদের সাথে কথা বলেছি এবং গোপনে গোপনেও তাদেরকে বুঝিয়েছি।'[৬৩]

এসব ওয়াজ, এসব দরস, এসব ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রচেষ্টা, এসব প্রকাশ্য ও গোপন সাধনা, এসব উপদেশ ও আত্মশুদ্ধি, এসব তাওয়াজ্জুহ ও পবিত্র শ্বাস-প্রশ্বাস মূলত প্রকাশ্য ও গোপন দাওয়াহরই বিভিন্ন রূপ।

---

৬১. সুরা হুদ : ৮৪
৬২. সুরা নুহ : ৫
৬৩. সুরা নুহ : ৮-৯

(বিদগ্ধ লেখক রহ. যেখানে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে জড়িত দীনের সকল ধারক ও শরিয়াহর সকল বাহকের ব্যাপারে এই সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উল্লেখ করলেন, সেখানে যারা তরবারির জিহাদ ও দীনের হেফাজতের কাজে নিয়োজিত এবং যারা দীনের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে জড়িত—তাদের মধ্যে একতা ও অভিন্নতা এবং ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা সময়ের কত বড় অতীব গুরুত্বপূর্ণ দাবি—তা সহজেই অনুমেয়।—বিন্যাসকারী)

পাঠকের পাতা
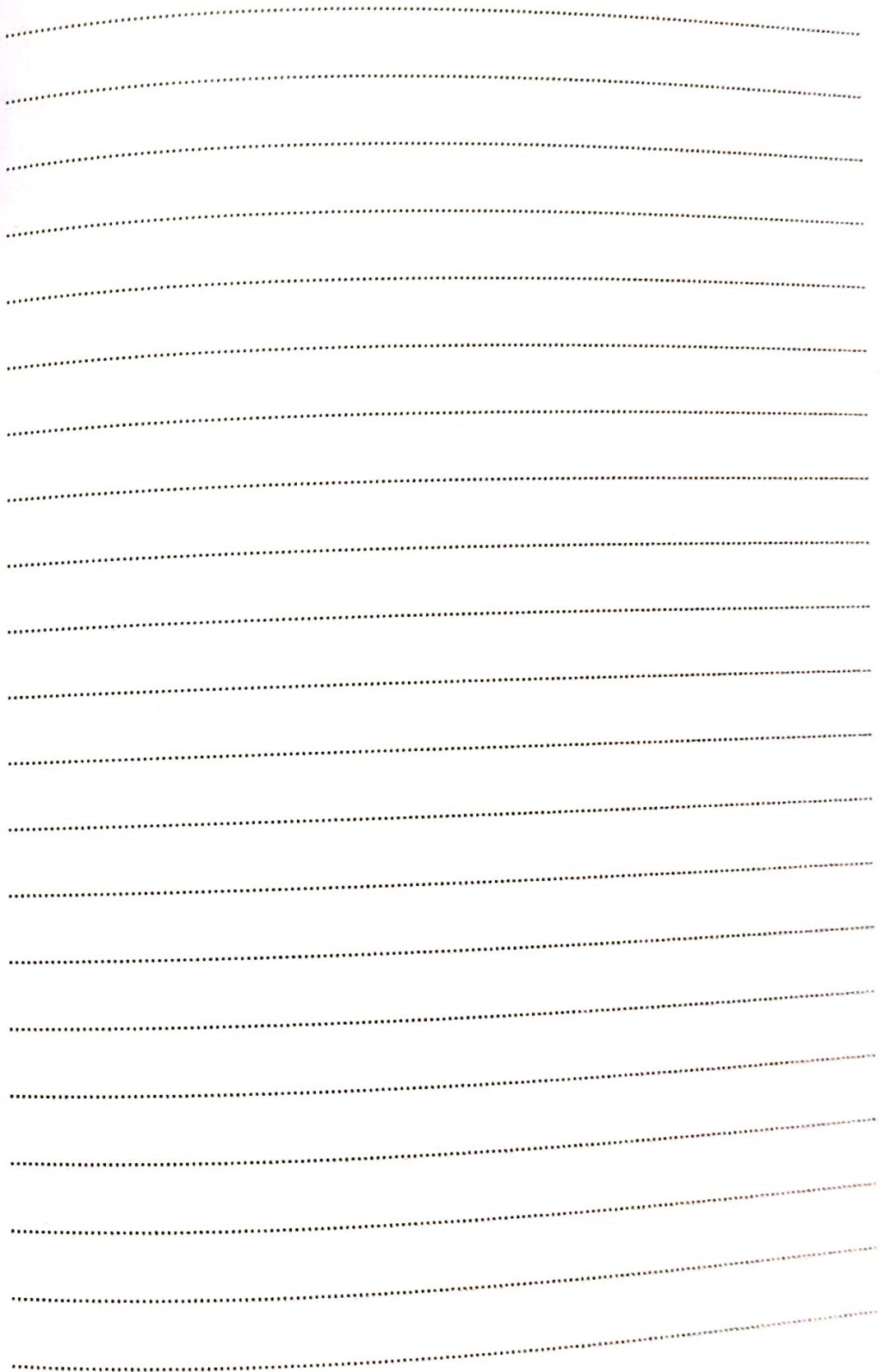
তিনি একাধারে রাবেতায়ে আলামে ইসলামি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, লখনৌর বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা'র রেকটর, ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর অস্তিত্ব কেবল ভারতীয় মুসলমানদের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যই এক বিরাট নেয়ামত। তাঁর বেশ ক'টি বই ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। একাধিকবার তিনি বাংলাদেশ সফরও করেছেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলকই গ্রন্থ এ পর্যন্ত ৭ খণ্ডে প্রকাশিত। 'কারওয়ানে জিন্দেগি' শুধু তাঁর আত্মজীবনীমূলক নয়, এটা সমসাময়িক বিশ্বের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও ব্যক্তির এক অপূর্ব আলেখ্যও বটে!

তাঁর রচনায় আল্লামা শিবলির অনবদ্যতা, আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদবির সূক্ষ্মদর্শিতা, মাওলানা মানাজির আহসান গিলানির সতর্কতা, মাওলানা আশরাফ আলি থানবির তাকওয়া, সর্বোপরি তাঁর পূর্বপুরুষ সায়্যিদ আহমদ বেরেলবি রহ.-এর দরদ প্রতিফলিত হয়েছে। শাইখুল হাদিস হজরত মাওলানা জাকারিয়া রহ., মাওলানা মনজুর নুমানি রহ. ও রায়িসুত তাবলিগ মাওলানা ইউসুফ কান্ধলবি রহ.-এর অনেক মূল্যবান গ্রন্থে তাঁর লিখিত সারগর্ভ ভূমিকাগুলো পড়বার মতো। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি মাওলানা আহমদ আলি লাহোরি রহ. ও মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরি রহ.-এর ইজাযতপ্রাপ্ত।

বিগত হিজরি ১৪২০ সনের ২২ রামাদান জুমআর পূর্বে সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াতরত অবস্থায় গ্রন্থকার ইনতিকাল করেন। রায়বেরেলির পারিবারিক কবরস্থান রওজায়ে শাহ আলামুল্লাহ্য় তাঁকে দাফন করা হয়।

- মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ

শহিদ সায়্যিদ কুতুব রহ. বলেন,

'আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের একটি হলো হাকিমিয়্যাহ। যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য আইন প্রণয়ন করে তখনই সে নিজেকে আল্লাহর বদলে এমন আরেক প্রভুর ভূমিকাতে বসিয়ে নেয়, যার আইনের আনুগত্য ও অনুসরণ করা হয়। আর যারা এই এক আইনপ্রণেতা বা অনেকজন আইনপ্রণেতার আনুগত্য করে, তারা আল্লাহর গোলামের পরিবর্তে আইনপ্রণেতাদের গোলামে পরিণত হয়। তারা অনুসরণ করে আইনপ্রণেতাদের রচিত দীনের; আল্লাহ তাআলার মনোনীত দীন ইসলামের নয়।

জেনে রাখুন আমার ভাইয়েরা, এটা আকিদার ক্ষেত্রে সবচে বড় বিপর্যয়। এটা হলো ইবাদত ও দাসত্বের প্রশ্ন। এটা হলো ইমান ও কুফরের প্রশ্ন। জাহিলিয়্যাত ও ইসলামের প্রশ্ন। জাহিলিয়্যাত কোনো নির্দিষ্ট সময় বা যুগ নয়; জাহিলিয়্যাত হলো একটি অবস্থা।'

- তাফসির ফি জিলালিল কুরআন